চাপাটি ও পদ্ম

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

চাপাটি ও পদ্ম

সিপাহি-যুদ্ধের কাহিনী

চাপাটি ও পদ্ম

সিপাহিগণ কর্ত্তৃক সঙ্কেতরূপে চাপাটি ও পদ্মফুল ব্যবহৃত হইত—
তাই বইখানার নাম চাপাটি ও পদ্ম।

পূর্বকথা

এই গ্রন্থের গল্পগুলি সিপাহিবিদ্রোহ ঘটিত। প্রথম গল্পটি কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের গোরার জন্মবৃত্তান্ত আছে—তাহাই উপজীব্য। পরিবেশ কাল্পনিক নয়। বাকি এগারটি গল্প এই অর্থে ঐতিহাসিক যে সিপাহিবিদ্রোহের কোন না কোন গ্রন্থে গল্পাঙ্কুরগুলি পাইয়াছি। কেবল নানাসাহেব গল্পটিতে কিছু স্বাধীনতা লইয়াছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পরিবেশ কাল্পনিক নয়। এক বিন্দু ইতিহাসের সহিত এক কলসী কল্পনা মিশ্রিত করিলে আর যাই হোক ঐতিহাসিক গল্প সৃষ্টি হয় না। ইতিহাস ও গল্প দুয়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া কলম চালনা কঠিন, সর্বত্র পারি নাই, সর্বত্র পারা যায় না। ঐতিহাসিক গল্পে ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কন গৌণ, মুখ্য ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনা। এ গ্রন্থে তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছে সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকগণের উপরে।

সিপাহিবিদ্রোহ প্রসঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ বিদেশীগণ কর্তৃক লিখিত। কাজেই অনুমান অনুচিত নয় যে সমস্ত বিবরণ সিপাহিপক্ষের প্রতিকূলে ঝুঁকিয়া আছে। ভারতের বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের দপ্তরখানায় ভারতীয়গণ কর্তৃক লিখিত সমসাময়িক বিবরণ থাকা অসম্ভব নয়। সামন্ত রাজ্য লোপ পাইবার পরে দপ্তরখানাগুলি ভারত রাষ্ট্রের আয়ত্ত হইয়াছে। এখন খুঁজিয়া পাতিয়া বিদ্রোহ-বিবরণ আবিষ্কার করিলে, প্রকাশ করিলে ইংরাজের অনুকূলে কাত নৌকাখানা ভারসাম্য লাভ করিলেও করিতে পারে। তখন ইতিহাস ও গল্প দুয়েরই চেহারায় বদল হওয়া অসম্ভব হইবে না।

সিপাহিবিদ্রোহের কাহিনী সামান্য যেটুকু পড়িয়াছি তাহাতে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহা প্রকাশের ক্ষেত্র এ গ্রন্থ নয়। বারান্তরে সুযোগ পাইলে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অধ্যাপক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহ ও অযাচিত গ্রন্থঋণ এগুলি রচনার একটি প্রধান কারণ। তিনি ভাল করিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন, আমি তো ঋণ স্বীকার করিয়া রাখি।

সূচীপত্র

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত

করকমলে—

তব গ্রন্থাগার থেকে বহু গ্রন্থ চেখে চেখে
গল্পগুলি করেছি বাহির।
সেই গল্পাঙ্কুরগুলি আকাশে মস্তক তুলি
বিদ্যা মোর করিছে জাহির॥
সিপাহি যে ক্ষেপেছিল অসি তার মেপেছিল
ইংরাজের অসির সহিত।
পুরাতন সে কাহিনী ইতিরস প্রবাহিনী
মন মোর করেছে মোহিত॥
ভারতের মাঠে বাটে কত নাট্যে কত নাটে
যুগে যুগে ঘটেছে এমন।
সব তার নাহি বুঝি তবু সেই সূত্র খুঁজি
পুঁথির পাতায় ঘোরে মন॥
ঘটনা-উপলগুলি খুঁটে খুঁটে নেয় তুলি
কত জন কত প্রয়োজনে।
মনের মতন ক'রে সাজাইয়া থরে থরে
নবরূপে সে কাহিনী ভনে॥
অর্থনীতিকের দল রহস্যের খোঁজে তল
নিয়মের শিকল নামায়ে।
টাকার শম্বুক গতি মাপিতে অভ্যস্ত অতি
মনোরথ হেঁসেলে থামায়ে॥
সবজান্তা রাজনীতি সর্বগ্রাসী আত্মপ্রীতি
দুই হাতে কোলে টানে ঝোল।
দলনারায়ণে তুষি আছে নিজ মনে খুশী
যত্রতত্র গোলে হরিবোল॥
না শিখে পণ্ডিত তারা ত্রিগুণে মণ্ডিত তারা
কিবা সর্ব গুণের পশরা।
বিধাতার ধরে ভুল বুদ্ধিতে বিচ্ছেদে চুল
বিশ্বে ভাবে দলের খসড়া॥

ইতিহাস হেঁট মাথে　　ব'সে রয় শূন্য পাতে
কেবা তার পাতে দেয় দই।
অপরের বাড়া ভাত　　তারা যে বাড়ায় হাত
সোল্লাসে গরজে হৈ হৈ॥

অর্থনীতি রাজনীতি　　'অশ্বত্থামা হতো ইতি'
বলে, 'গজ' রেখে দেয় হাতে।
সেই গজকাঠি দ্বারা　　বিশ্বের প্রবাহ তারা
মেপে চলে দিবসে ও রাতে॥

আকাশে দেখিলে মেঘ　　ছুটে আসে বায়ুবেগ
প্রত্যাশিয়া বৃষ্টির পশলা।
সিপাহি বিদ্রোহ মাঝে　　(নিষ্কর্মায় খই ভাজে)
সঁপিয়াছে গরম মশলা॥

পুরাণো কাসুন্দি মথি'　　তোলে নব তত্ত্ব অতি
যত্র তত্র নূতন অছিলা।
ভারতীয় কি ইংরাজ　　নগণ্য হয়েছে আজ
আমি দেখি মানুষের লীলা॥

যে মানুষ দেশে কালে　　বিশ্ববিধাতার ভালে
রচিয়াছে নূতন নয়ন।
তারি হাসি অশ্রু নিয়ে　　'মনের মাধুরী' দিয়ে
বুনি আমি বাঙ্ময় বসন॥

দূরে থেকে তবু কাছে　　কবি চিরদিন আছে
কল্পনায় রচি ছায়াপথ।
কাছে থেকে তবু দূরে　　কবি রহে সুরপুরে
স্বপ্নে-রচা বাস্তব জগৎ॥

যখন সে হাটে ঘোরে　　মন-ঘুড়ি উর্ধ্বে ওড়ে
সুতা ছাড়ে ভাবের লাটাই।
কভু ডুবুরীর মতো　　তুলে আনে মুক্তা যত
সে-সিন্ধুর তীর তল নাই॥

দু'নৌকায় পা যে তার মাঝে বহে খরধার
কবি-ব্রত বিষম কঠিন।
লোকে তাই নাহি বোঝে বৃথা তার অর্থ খোঁজে
অবশেষে বলে অর্থহীন ॥

সারদার টাঁকশালে তার অর্থ নেয় ভালে
সযতনে নব চিহ্ন লিখি।
পাই নি মোহর টাকা তবু ঝুলি নহে ফাঁকা
জুটিয়াছে আধুলি ও সিকি ॥

কবি নহে জলচর নহে সে যে স্থলচর
খোঁজে সে যে আকাশের ডাঙা।
জালের খোঁটার পরে ব'সে থাকে মৌন ভরে
ধ্যানপ্রজ্ঞ যেন মাছরাঙা ॥

মাছটি লাফালে পরে ছুটে গিয়ে টুঁটি ধরে
পাখনায় নাহি লাগে জল।
Escapist ব'লে কেউ পেয়ালায় তোলে ঢেউ
কেহ শুধু করে কোলাহল ॥

কেহ বলে এতো সোজা চালাকি গিয়েছে বোঝা
পক্ষীবেশে ওটা যে বুর্জোয়া।
দেখ জিভে ঝরে জল তবু লক্ষ্য অচপল
আমাদের হাতের এ মোয়া ॥

এই মতো কত গুনে কত চিন্তা করে মনে
ইতিমধ্যে বই কাটে উই।
বাজারে করিয়া দেনা হ'ল গৃহসজ্জা কেনা
ঝড়ে গেল ঘরের যে টুঁই ॥

বইয়ের কপালখানি মনে মনে খুব জানি
বুঝিয়াছি খান ষাট লিখে।
প্রথম মুদ্রণে বটে প্রায়শঃ নির্বাণ ঘটে
অভ্যাস হলনা তবু শিখে।

যাই হোক যাহা পাই আধখানা তব ভাই

ইথে নাহি হবে অপ্রতুল।

জোটে যদি পূর্ণচন্দ্র আধখানা তব, সন্দ

করিও না হবে মোর ভুল॥

২৩-১১-৫৫

সেই শিশুটি

কৃষ্ণদয়ালবাবু তাঁহার বাংলো বাড়ীর বারান্দায় অধীরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন। একবার দাঁড়ান, একবার চলেন, কখনো বা একখানা বেতের চৌকির উপরে বসেন, কখনো বা বারান্দার প্রান্তে রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া শিষ দিতে থাকেন, আবার ফিরিয়া ড্রয়িং রুমের দরজার পর্দা তুলিয়া দেখেন, কিন্তু কিছুতেই ভরসা পান না, মুখে বিরক্তির চিহ্ন ক্রমে স্ফুটতর হইয়া ওঠে। অবশেষে যখন তিনি ভিতরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ভিতরের দিক হইতে একজন দাসী আসিয়া বলিল—মেম সাহেব বল্‌লেন তিনি আজ বেড়াতে যাবেন না!

কৃষ্ণদয়ালবাবু ইংরাজি কায়দায় বলিয়া উঠিলেন—'হুম্' এবং হাতের ছড়িখানা চৌকির উপরে রাখিয়া দিয়া হন হন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কৌতূহলী দাসী একবার ভিতরে যাইতে পা বাড়াইয়াছিল, বোধ করি সাহসে কুলাইল না, ফিরিয়া আসিয়া বারান্দার সম্মুখে যে বড় নিম গাছটা ছিল তাহারই ছায়াতে দাঁড়াইল।

দাসীটির বয়স খুব বেশি হইবে তো পঁচিশ বছর, শ্যামবর্ণ, মুখে গোটা কয়েক বসন্তের দাগ, হিন্দুস্থানী ধরণে রঙীন শাড়ী পরিহিত, উপরির মধ্যে গায়ে একটি শেমিজ। সে বাংলা বলে বটে কিন্তু হিন্দু-স্থানীর মুখের বাংলা, কিছু বাঁকা।

এমন সময়ে ড্রয়িং রুমের দুটি ভিন্ন কণ্ঠে সংলাপ শ্রুত হইল, দাসী উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

—বেড়াতে যাবে না কেন শুনি।

—শেমিজ পরে, জুতো পায়ে দিয়ে মেম সাহেব সেজে আমার বেড়াতে যেতে ভালো লাগে না।

—জুতো পায়ে দিলে, শেমিজ পরলেই মেম সাহেব হ'য়ে যায়? আর তা ছাড়া মেম সাহেবরা খাটো কিসে?

—খাটো বলছি নে, মেম সাহেবের মতো মেম সাহেব থাকুক, হিঁদুর মতো হিঁদু থাকুক।

—দেখো, তোমার অত হিঁদুয়ানি এখানে চলবে না।

অপর কণ্ঠ ইহার কোন উত্তর করিল না। উত্তর না পাইয়া কৃষ্ণদয়ালবাবুর কণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল—নাঃ তোমাকে কাশী থেকে এখানে এনে অবধি আমার শান্তি নেই। সাহেব সুবোকে যে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবো, তোমার হিঁদুয়ানির জন্য তার উপায় নেই। এখন দেখছি চাকরির উন্নতির আশা তো নেই-ই, এবারে চাকরিটা না যায়।

—চাকরি রাখতে গেলে মেম সাহেব সাজতে হবে নাকি?

—একশ বার হবে। নবাবী আমলে মেয়েরা বিবি সেজেছে, এখন কোম্পানীর আমলে মেম সাহেব সাজবে। যে-সময়ের যে-রীতি।

তার পর একটু থামিয়া কৃষ্ণদয়ালবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মনে নেই সেদিন বগি করে ফিরবার সময়ে ডানিয়েল সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি কত খুশী হলেন! বললেন—মুখার্জি, তুমি জেনানা মানো না দেখছি, বড় সন্তুষ্ট হলাম। এই বলে সাহেব, মেম সাহেব তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক করলেন।

—মনে আবার নেই। ফিরে এসে স্নান ক'রেও সারারাত গা ঘিন-ঘিন ক'রে মরি।

—আহা, ফিরে এসে না হয় স্নান করো, গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রো, নিষেধ করছে কে?

—ভাষায় কর নি, ভাবে করেছ। আমাকে জব্দ করবার জন্যই তুমি ঐ খৃষ্টান মেয়েটাকে বাড়ীতে এনে রেখেছ। কেন হিঁদু দাসী কি মিলতো না?

—লছমিয়া তো তোমার পূজোর ঘরে যায় না, রান্না ঘরে যায় না।

—বাড়ীতে থাকে তো, উঠোনে চলাফেরা করে তো।

—হিঁদু দাসী কি ওদের মতো কাজ জানে? তা ছাড়া সাহেব মেম বাড়ীতে এলে ওরা আদব কায়দা সব জানে। গুণের আদর করতে হবে তো।

—এখন সাহেবরা তোমার এ গুণের আদর করলে হয়।

কথাটা যে ভাবেই কথিত হোক কৃষ্ণদয়ালবাবু অন্যভাবেই গ্রহণ করিলেন, বলিলেন—সাহেবদের মতো গুণের আদর করতে জানে কে? আমি ওদের সঙ্গে ব'সে খানা খাই, বগি হাঁকিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াই, বাড়ীতে খৃষ্টান দাসী রাখি এসব জানবার পর থেকে অল্প ক'মাসের মধ্যে আমার দুটো 'লিফ্ট' মানে দু'বার উন্নতি হয়েছে। পরেশ এখনো সেই জুনিয়ার গ্রেডে ঘষড়াচ্ছে।

কৃষ্ণদয়ালবাবু স্ত্রীকে জানিতেন বলিয়াই বুঝিলেন যে তর্কে পরাস্ত করিয়া কাজ আদায় করা সম্ভব হইবে না, তাই কণ্ঠস্বরে এবারে একটু অনুরোধমিশ্রিত আবদারের রস সঞ্চারিত করিয়া বলিলেন—সপ্তাহে এই রবিবারটাতেই যা বেড়াবার সুযোগ। যাও লক্ষীটি চট করে কাপড় বদলে এসো, দেরী হলে সাহেবরা গির্জায় চলে যাবে, তখন কারুর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

অন্যপক্ষ নিরুত্তর, বোধ করি সে কাপড় বদলাইতেই গেল।

কৃষ্ণদয়ালবাবু বাহিরে আসিতেছিলেন, ফিরিয়া গিয়া হাঁকিয়া বলিলেন—নন্দি, তোমার নূতন জুতোজোড়াটা পরতে ভুলো না যেন, ম্যাজিস্ট্রেটের মেমের পায়ের নমুনা দেখে কিনেছি।

উদ্যোগপর্ব একপ্রকার সমাধা করিয়া কৃষ্ণদয়ালবাবু বারান্দায় চৌকিটার উপরে বসিলেন, অপস্রিয়মান দাসীর উদ্দেশে বলিলেন, লছমিয়া, কোচম্যানকে শীগ্‌গীর গাড়ী জুতে আনতে বলো।

এই বলিয়া তিনি একটি সিগারেট ধরাইলেন, বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কি ভাবিতেছিলেন জানি না, হয়তো ভাবিতেছিলেন, আজকার মতো কোনক্রমে তো জোড়াতালি দিয়া চলিয়া গেল, এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে।

কৃষ্ণদয়ালবাবু সংসারের রহস্য জানিলে বুঝিতে পারিতেন, এমনি

করিয়াই চালাইতে হইবে কারণ মানুষের জীবন একটি অন্তহীন জোড়া-তালির মালিকা।

কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জে এটোয়া শহরে কমিশারিয়েট দপ্তরে কাজ করেন। প্রথম প্রবেশের সময়ে তিনি কনিষ্ঠ কেরাণীর দলে ছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নানা উপায়ে, যাহার কিছু কিছু নিজ মুখেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, কৃষ্ণদয়ালবাবু কমিশারিয়েট দপ্তরের দেশীয় চাকুরেদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

"ইহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া যখন মারা যান তখন ইহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে একেবারে পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাশী-বাসী সার্বভৌম মহাশয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। পশ্চিমে কৃষ্ণদয়াল চাকরির জোগাড় করিলেন এবং মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে সার্বভৌমের মৃত্যু হইল, অন্য কোন অভিভাবক না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল। ইতিমধ্যে যখন সিপাহীদের মিউটিনি বাধিল—"

২

এবারে লছমিয়ার বদলে রামদীন আসিল, বলিল, হুজুর, কোচম্যান লোক নেহি আয়া হ্যায়।

—কেঁও ?

—মালুম নেহি হুজুর। শুনতা শহরমে হল্লা হো রহা হ্যায়।

—হল্লা! কিস্‌কা হল্লা ?

—কেয়া জান্‌তা হুজুর। সিপাহী লোক হল্লা কিয়া থা।

রামদীন সরলভাবে বলিলে সব কথাই স্বীকার করিতে পারিত।

সিপাহীদের অসন্তোষের ভাব তাহার অজ্ঞাত থাকিবার বিষয় নয়। বস্তুতঃ যাহাদের উপর সিপাহীদের ভার এবং দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল তাহারা ছাড়া আর সবাই আসন্ন ঝটিকার খবর রাখিত। কৃষ্ণদয়ালবাবুর এসব খবর জানিবার কথা নয়, বিশেষ তাঁহার বাংলো শহরের বাহিরে নদীর ধারে। তাঁহার বাড়ীর উত্তরে 'সিভিল লাইন' বা সাহেবপাড়া, তার পরে শহর।

সিপাহীদের হল্লার কথা যতটুকু তিনি বিশ্বাস করিলেন তাহাতেই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, বলিলেন—রামদীন, একবার খবর নিয়ে আসতে পারো ?

কিন্তু কোথায় রামদীন। সে অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু কষ্ট করিয়া খবর সংগ্রহের প্রয়োজন আর ছিল না, খবর সশব্দে আসিয়া পৌঁছিল।

হঠাৎ শহরের দিক হইতে একযোগে অনেকগুলি বন্দুকের আওয়াজ উঠিল, তার পরেই জনতার কোলাহল। তারপর হইতে কোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজের আর বিরাম রহিল না। কৃষ্ণদয়ালবাবুর এমন সাহস হইল না যে একটু নড়িয়া চড়িয়া খবর সংগ্রহ করেন, কিন্তু তার প্রয়োজনও ছিল না, বারান্দায় বসিয়া যাহা দেখিতে পাইলেন কমি-শারিয়েটের হেড ক্লার্কের প্রাণ শুকাইয়া দিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

কৃষ্ণদয়ালবাবু দেখিতে পাইলেন যে, সিভিল লাইনের অন্তর্গত সাহেবদের বাংলোগুলি জ্বলিতেছে, আর ইতস্ততঃ সিপাহীরা কেউ বা দেশী পোষাকে, কেউ বা সরকারী পোষাকে ঘোরাফিরা করিতেছে। এটোয়াতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হইয়া গিয়াছে।

"এটোয়াতে স্থিত নয় সংখ্যক নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বিদ্রোহ করিল। (ইংরাজ) মহিলা ও বালক-বালিকাদের লইয়া সাহেব অফিসারগণ গোয়ালিয়রের অভিমুখে যাত্রা করিয়া বরপুরা নামে একটি থানাতে নিরাপদে পৌঁছিল, তাহাদের সঙ্গে রহিল সেই সব দেশীয় সৈন্য যাহারা বিদ্রোহে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এটোয়া বিধ্বস্ত হইল,

ট্রেজারি লুষ্ঠিত হইল, জেলখানা হইতে কয়েদীরা মুক্ত হইল, অরাজ-কতার বিভীষিকা আরম্ভ হইয়া গেল।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কৃষ্ণদয়ালবাবু বসিয়া আছেন এমন সময়ে পিছনে পদশব্দ শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, ফিরিয়া দেখিলেন—ওঃ তুমি।

গোলমাল শুনিয়া আনন্দময়ী বাহিরে আসিয়াছেন, তাঁহার গায়ে বেড়াইতে যাইবার কাপড়।

—কি হয়েছে ?

—কেমন করে জানব কি হয়েছে। রামদীন বলছিল সিপাহীরা নাকি ক্ষেপে উঠেছে।

—সিপাহীরা ক্ষেপতে যাবে কেন ?

—সে কথা সিপাহীরা জানে। রামদীনও জানতে পারে।

—কোথায় সে ?

—ছিল তো এখানেই।

—একবার দেখি কোথায়, এই বলিয়া আনন্দময়ী যেমনি বারান্দা হইতে নামিতে গিয়াছেন, কৃষ্ণদয়াল লাফাইয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, না, না, ওদিকে যেও না।

—কেন এত ভয় কিসের ?

—সিপাহীরা যে ক্ষেপেছে।

—দেশী লোককে কিছু বলবে না।

—আরে বাঙালীদের ওরা ছোট সাহেব মনে করে, খুব বলবে।

ভীত স্বামীর ভয়কে আর বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আনন্দময়ী রামদীনের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইলেন, তার বদলে ডাকিলেন, লছমিয়া।

লছমিয়া নিকটেই কোথাও ছিল, আসিল, তাহার মুখ শুষ্ক, সে আনন্দময়ীর পায়ের কাছে বারান্দার উপর বসিয়া পড়িল। আনন্দময়ী শুধাইলেন—কিছু জানিস ?

সে বাঁকা বাংলায় যাহা বলিল, তাহার মর্ম এই যে, এখান হইতে

যাহা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে তাহার বেশি জানে না। পরে বলিয়া উঠিল, আমাকে আস্ত রাখবে না।

—কেন?

—আমি যে খৃষ্টান।

—তুই খৃষ্টান হলেও দেশী লোক, তাছাড়া খৃষ্টান কি তোর গায়ে লেখা আছে?

—আছে মা, আছে। খৃষ্টান ছাড়া আর শেমিজ পরে কে?

—তবে ছেড়ে ফেল গে।

—তোমারও তো পরনে শেমিজ।

—আমার জন্য ভাবিস নে।

তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া কৃষ্ণদয়াল ভাবিলেন লছমিয়ার যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তিনি ভাবিতেছিলেন চামড়ার খাতিরেই বাঘটা বাঘ, চামড়া খুলিয়া লইলে শিয়াল কুকুরের সঙ্গে তাহার প্রভেদ কোথায়? গাঁওয়ার সিপাহীরা পোষাক দেখিয়াই যদি জাতি নির্ণয় করে তবে শেমিজ ও কোটপ্যাণ্ট কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই, অতএব—

—লছমিয়ার কথাটা নিতান্ত মন্দ নয়।

—কেন?

—গাঁওয়ার সিপাহী শেমিজ দেখলে ক্ষেপে উঠতে পারে।

—তবে তো তোমার কোট পাণ্টলুন আগে ছাড়া দরকার।

—আমি তো ছাড়বোই—এই বলিয়া তিনি সবেগে ভিতরে প্রস্থান করিলেন, বলিয়া গেলেন, তোমরাও আর দেরী ক'রো না।

দাসী ত্বরিত পদে প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

আনন্দময়ীর ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটুখানি হাসির আভাস দেখা দিল, তিনি অর্ধব্যক্ত স্বরে বলিলেন,—ওদিকে সিপাহীরা ক্ষেপেছে এদিকে দেখছি বাঙালী বাবুও ক্ষেপে উঠল।

অন্তঃপুরে এতক্ষণে না জানি কি কাণ্ড ঘটিতেছে দেখিবার জন্য তিনি প্রস্থান করিলেন।

সে রাত্রে মুখুজ্জে পরিবারের কাহারো আহার হইল না। আর ঘুম, শুধু সে পরিবারে কেন, সে রাত্রে নিদ্রা শহরেই পদার্পণ করিল না। সারারাত্রি শহরময় যে কাণ্ড চলিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। সময়টা জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদারুণ খরার সময়; যেখানে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িতেছে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিতেছে, বাঁশের গিরা ফাটিতেছে ফটাস; গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড একটি অগ্নিময় জিহ্বা আকাশে প্রসারিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জনতার উল্লাসের আর একটি শব্দময় জিহ্বা তাহার প্রতিস্পর্ধা করে। জানলার ধারে বসিয়া মুখুজ্জে দম্পতি দেখিতেছে অদূরে—ক্ষণে আলো ক্ষণে আঁধারে ঠাহর হয় না ঠিক কত দূরে, অসংখ্য ছায়ামূর্তি রহিয়া রহিয়া ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে, দেখিতেছে অগ্নিবলয় ক্রমেই স্ফীত হইয়া চলিয়াছে, বৈশ্বানরের রক্ত-অশ্বের একি ভয়াবহ অশ্বমেধ লীলা; শুনিতেছে ওখানে প্রচণ্ড কোলাহল, অথচ এখানে স্বপ্নময় অস্বাভাবিক এক নৈঃশব্দ্য; তাহারা অভিভূতের ন্যায়, স্তম্ভিতের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায় একাসনে বসিয়া প্রহর যাপিতে লাগিল। বাড়ীতে চাকর, দারোয়ান, কোচম্যান, চাপরাশিতে অনেকগুলি প্রাণী, কিন্তু কোথায় তাহারা সব! কেবল ঐ লছমিয়া পাশের ঘরটিতে প্রভু-দম্পতির মতোই ভীতিবিহ্বল হইয়া বসিয় আছে। ক্রমে কালরাত্রি প্রভাত হইল। সে কি প্রভাত, সে কি দৃশ্য, প্রলয়-রাত্রির অবসানে সূর্য উদিত হইলে বোধ করি জগতের এইরূপ ভগ্নদশা প্রকট হয়!

ভোর হইলে আনন্দময়ী স্বামীর জন্য চা তৈয়ারী করিয়া দিলেন। কিন্তু তার পরেই মুস্কিল, আহার্য না থাকিবার মধ্যেই: চাল, ডাল, তেল, নুন অবশ্য আছে, কিন্তু তরিতরকারি মাছ? এদিকে চাকর দারোয়ানেরও দেখা নাই। কৃষ্ণদয়াল বিস্মিত হইলেন, তাহারা গেল কোথায়? বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে তিনি

বুঝিতে পারিতেন যে, ঝড় উঠিলে গাছের ফল পড়ে, ফল কুড়াইতে লোক ছুটিয়া যায়, বিদ্রোহ ঘটিলে তাহার বাস্তব ফল কুড়াইবারও তেমনি লোকের আবশ্যক হয়।

অগত্যা কিছু তরিতরকারি সংগ্রহের আশায় কৃষ্ণদয়ালবাবু বাহির হইলেন। খানিকটা আসিয়া সিভিল লাইনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি দৃশ্য। দগ্ধ বাংলোগুলার তপ্ত প্রাচীর চারটা শূন্যে হাত তুলিয়া দণ্ডায়মান, এমন সারি সারি। বাংলোর প্রাচীরগুলা স্থাবর বলিয়াই বোধ করি আছে—আর কিছুই নাই। জানালা, দরজা, খাট, চৌকি, আলমারি, আসবাবপত্র সমস্ত অপসৃত। যাহা লওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা ভগ্নাবস্থায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। অকিঞ্চিৎকর জঙ্গম পদার্থ এখনো যা দু'চারটি আছে, বিদ্রোহের বাস্তব ফল লাভেচ্ছুগণ নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা সরাইতেছে। আইন ও শৃঙ্খলার লেশমাত্রও কোথাও নাই। কৃষ্ণদয়ালবাবু ভাবিলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একি পরিবর্তন। কোম্পানীর সরকারের উপরে তাঁহার মতো লোকের অটল বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস টলিয়া যাওয়াতে নিজেকে তিনি ভারকেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতো বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আর চলিতে পারিলেন না, কেন বাহির হইয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িল না, তিনি যন্ত্রবৎ ফিরিয়া আসিলেন। ঐ দগ্ধ বাংলোগুলার শূন্য প্রাচীর-গুলার মতোই তাঁহার অবস্থা এখন নিরর্থক।

সন্ধ্যার সময় মুখুজ্জে দম্পতি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় লছমিয়া ঢুকিল। আনন্দময়ী শুধাইলেন—লছমিয়া কি খবর?

—তেওয়ারি এসেছিল।

তেওয়ারি বাড়ীর অন্যতম চাকর।

—কাল থেকে কোথায় ছিল?

লছমিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, বলিল, মাইজি, কি হয়ে গেল।

—কেন রে?

—দানিয়েল সাহেব গুলি লেগে মরলো। হিউম সাহেব আর আর গোরা লোগ, বিবিলোগ সব পলাইল।

—কার কাছে শুনলি?

—তেওয়ারি বল্‌লে।

—আর কি বল্‌ল?

—বল্‌ল যে কোম্পানীর মুল্লুক খতম হইয়ে গেল।

—এবার কার মুল্লুক হ'ল।

—বাদশার. দিল্লীর বাদশার।

এতক্ষণ কৃষ্ণদয়ালবাবু শ্রোতামাত্র ছিলেন, কিন্তু সংলাপ রাজদ্রোহিতার সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন—ওসব বাজে কথা রাখ্‌।

—তেওয়ারিটা গেল কোথায়?

—সিপাহী লোগ দিল্লী চলছে। তেওয়ারিভি দিল্লী যাইছে।

কৃষ্ণদয়ালবাবু নিষ্ফল আক্রোশে ভাবিতে লাগিলেন চব্বিশ ঘণ্টা আগে হইলেও তিনি তেওয়ারিকে দেখিয়া লইতেন। বহু দিনের বাঙালী সংস্কার কয়েকটি শব্দ সমন্বয়ে তাঁহার অন্তরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—যত সব ছোট লোকের আস্পর্ধা।

এমন সময়ে ঘরের বাহিরে একটি অস্ফুট আর্তনাদ উঠিল। রাত্রি তখন অতীতপ্রহর।

৪

স্তিমিত-আলোক গৃহের মধ্যে চাপা গলায় মুখুজ্জে দম্পতি কথা বলিতেছিলেন। কৃষ্ণদয়াল শুধাইলেন—কি হ'ল?

আনন্দময়ী বলিলেন—একটি ছেলে, বেশ ফুটফুটে আর বেশ সবল।

—কিন্তু এ আপদ এখন রাখি কোথায়?

—প্রসূতির অবস্থা ভালো নয়, বোধ হয় টিকবে না।

—বলো কি, কিন্তু তার আগেই আমাদের না নিকেশ হতে হয়।

—কেন ?

—কেন, বোঝো না ? সিপাহীরা খবর পেলে কি আর আমাদের আস্ত রাখবে ?

—ভাগ্যি ভালো যে আজ তোমার পশ্চিমা চাকর-দারোয়ানগুলো নেই, থাকলে জানাজানি হয়ে যেতো।

—কিন্তু লছমিয়া তো আছে !

—আরে সে যে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক কি স্ত্রীলোকের এমন বিপদে সাড়া না দিয়ে পারে। লছমিয়াকে কা'র কোন ভয় নেই।

—কিন্তু মেয়েটা এখানে এলো কোথা থেকে কিছু শুনেছ ?

—ওরা আইরিশম্যান না এমনি কি বলছিল।

—হ্যাঁ আয়ারল্যাণ্ডের লোককে আইরিশম্যান বলে।

—ওর স্বামী পাদ্রী। ওরা থাকতো শিকোয়াবাদে, অনেককাল সেখানে ছিল, সেখানেই হিন্দুস্থানী শিখেছে, বেশ হিন্দী বলতে পারে।

—কি বলল ?

—শিকোয়াবাদের সিপাহীরা ক্ষেপে উঠলে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে পালিয়ে এটোয়া আসবে বলে রওনা হয়। ওদের ধারণা ছিল, এখানে গোলযোগ ঘটে নি।

—তারপরে ?

—আজ বিকালবেলা সিপাহীরা ওর স্বামীকে হত্যা করে। মেয়েটা কোন রকমে লুকিয়ে নদী বরাবর চলতে আরম্ভ করে, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ীর কাছে এসে বসে পড়তে বাধ্য হয়, আর চলবার শক্তি ছিল না। মেয়েটা বারবার বলছিল, তোমরা আশ্রয় না দিলে পথে পড়ে মরতে হত।

—এখন কি করছে ?

—ও বুঝতে পেরেছে যে, ওর আর বেশি সময় নেই, ওর স্বামী

নাকি ওকে ডাকছে। বলছে কোন রকমে ছেলেটাকে তোমরা রক্ষা করো।

—দাঁড়াও আগে আমরা রক্ষা পাই।

—কে আর জানছে? আছে তো ঐ গোয়াল ঘরে।

—যারা জানবার ঠিকই জানবে।

এমন সময়ে লছমিয়া ঘরে ঢুকিয়া আনন্দময়ীকে কি যেন বলিল। কৃষ্ণদয়াল ব্যস্তভাবে শুধাইলেন—আবার কি হল?

—যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হয়েছে।

কৃষ্ণদয়াল চমকিয়া উঠিলেন—কেউ খবর পেয়েছে নাকি?

—না, মেয়েটা মারা গেছে।

—যাক, একটা আপদ তো চুকলো। ভগবান!

কৃষ্ণদয়ালের মতো লোকের মুখে ভগবানের নাম শুনিয়াই বুঝিতে পারা উচিত, তাঁহার উদ্বেগের গুরুত্ব কি বিষম।

তিনি শুধাইলেন—কিন্তু এখন মৃতদেহটা নিয়ে কি করবে?

—যা করবার আমরা করছি। তুমি চুপ করে থেকো।

—ছেলেটা?

—ঘুমুচ্ছে। তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই।

এই বলিয়া আনন্দময়ী লছমিয়াকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণদয়াল কতক্ষণ একলা ছিলেন, সে জ্ঞান বোধ করি তাঁহার ছিল না। যখন সম্বিৎ হইল, কানে শুনিলেন দেয়ালের ঘড়িতে তিনটা বাজিতেছে আর চোখে দেখিলেন সম্মুখে সিক্তবসনা আনন্দময়ী।

—একি কাপড় ভিজলো কি করে?

—লছমিয়া আর আমি ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে দেহটা নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। তাই একটা ডুব দিতে হল।

—যাক, বাঁচিয়েছ। এখন ছেলেটাকে নিয়ে কি করি?

—সে আমি দেখবো। তুমি একটু শোও দেখি।

—আর কি শোবার সময় আছে। বাইরে এতক্ষণে বোধ করি আলো হয়েছে।

—তবে থাকো, আমি আসি। বলিয়া আনন্দময়ী প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, তখনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখো, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, সব অস্বীকার করবে।

—যদি তল্লাসী করতে চায়?

—বাধা দিও না, একে একে সব ঘরগুলো দেখিয়ে দিয়ো।

—কিন্তু—

—কিন্তু আমি বুঝবো, তোমার চিন্তা নেই।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

আনন্দময়ীর আশঙ্কাই বুঝি সত্য হয়। কারণ ঠিক পর মুহূর্তেই সম্মুখে একদল লোকের পদশব্দ শ্রুত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা নাকাড়া বাজিয়া উঠিল। নাকাড়ার শব্দ থামিলে একজন নকীব তারস্বরে হাঁকিল—

খাল্‌ক-ই-খুদা
মুল্‌ক্‌-ই-বাদশা
হুক্‌ম্‌-ই-সিপাহী।

নকীব থামিলে দরজায় ঘা পড়িল, এ মুখার্জিবাবু, এ মুখার্জিবাবু। মুখার্জিবাবু ঘরের মধ্যে বসিয়া পলকে প্রলয় গণিতেছিলেন, পাছে দরজা ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়ে অথচ দরজা খুলিবারও সাহস নাই, তাই মাঝামাঝি রফা করিয়া জানলা খুলিয়া হিন্দিতে শুধাইলেন—কি বাবা সব।

অপর পক্ষ হইতে হিন্দিতে বলিল—দরজা খুলুন। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে আপনার বাড়ীতে এক ফিরিঙ্গি মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

কৃষ্ণদয়াল ইতস্তত কারতেছেন, দরজা খুলিবেন কিনা, এমন সময়ে পিছন হইতে আনন্দময়ী বলিলেন, দরজা খোলো, তারপরে চাপা গলায় বলিলেন, কোন ভয় নেই।

কৃষ্ণদয়াল দরজা খুলিয়া দিলেন, একসঙ্গে চার পাঁচজন সিপাহী ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের একজন বলিল—আমরা বাড়ী তল্লাসী করবো।

আনন্দময়ী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, বেশ তো এসো।

আনন্দময়ীকে দেখিয়া সিপাহীরা সম্ভ্রম প্রকাশ করিল, বলিল, মাইজি সেলাম। কিন্তু তাহাদের সঙ্কল্প টলিল না। তখন আনন্দময়ী আগে আগে চলিলেন, পিছনে চলিল সিপাহীরা, সকলের পিছনে চলিলেন কৃষ্ণদয়ালবাবু। তখন মনে মনে নিশ্চয় তিনি ভগবানের নাম করিতেছিলেন। কারণ সিপাহীদের ভাবগতিকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, হিউম সাহেবের প্রতাপের দিন গত হইয়াছে।

আনন্দময়ী একে একে ঘরগুলি দেখাইতেছেন।

—এই দেখো শোবার ঘর।

—এই আর একটা শোবার ঘর।

—এই ঘরে বাক্স পেঁটরা থাকে।

—এই যে খাবার ঘর, তার পাশেই ভাঁড়ার ঘর। না, না, বাধা নেই ভিতরে এসে দেখো।

সিপাহীরা আর ভিতরে আসিল না, বাহির হইতে উঁকি মারিয়া মাত্র দেখিল।

—মাইজি, ওটি কিসের ঘর ?

—গোয়াল ঘর। চলো ওদিকে যাই।

—দেখলে তো, আর বৈঠকখানা ঘর তো গোড়াতেই দেখেছ। আর তো বাপু কোন ঘর নেই।

সিপাহীরা বুঝিল ভুল সংবাদ পাইয়াছিল।

একজন সিপাহী শুধাইল, মাইজি ও ঘরটি তো দেখালেন না।

—ভুল হয়েছিল বাপু। ওটি আমার পূজোর ঘর, ওখানে ঠাকুর আছে ; চলো দেখবে।

সিপাহীরা জিভ কাটিয়া বলিল, শরম কা বাৎ হ্যায় মাইজি।

তারপর কৃষ্ণদয়ালের দিকে তাকাইয়া যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ হইতেছে—যদিচ বাঙালীবাবুরা আচার বিচার মানে না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না, তাহাদের একরকম খৃষ্টান বলিলেই হয়, তবু ঠাকুরঘরে ফিরিঙ্গিকে স্থান দিবে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

অতঃপর সিপাহীরা মুখুজ্জে দম্পতিকে, বিশেষভাবে আনন্দময়ীকে সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

তাহারা নিরাপদজনক দূরত্বে চলিয়া গেলে কৃষ্ণদয়াল শুধাইলেন, ছেলেটাকে কি করলে? নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছ নাকি?

আনন্দময়ী বলিয়া উঠিলেন, ষাট, ষাট, অমন কথা বলতে নেই।

—তবে কোথায়?

—দেখবে এসো।

স্বামীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঠাকুরঘরে দরজা খুলিলেন, কৃষ্ণদয়াল দেখিতে পাইলেন, আনন্দময়ীর আরাধ্য দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তির পায়ের কাছে লছমিয়ার কোলে শুইয়া নবজাতক নিশ্চিন্ত মনে আঙুল চুষিতেছে!

কৃষ্ণদয়ালের মনে হইল, তিনি এক অসম্ভব স্বপ্ন দেখিতেছেন।

তিন চারদিন পরের ঘটনা। কানপুর হইতে একদল বৃটিশ সৈন্য এটোয়াতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এটোয়া এখন শান্ত; আইন ও শৃঙ্খলা আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পথের মোড়ে লাল পাগড়ি এবং ইতস্ততঃ লালকোর্তা দেখিয়া কৃষ্ণদয়ালের সাহস যে-পরিমাণে বাড়িয়াছে, ভগবদ্‌ভক্তি সেই পরিমাণে কমিয়াছে, কৃষ্ণদয়াল বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভগবান সাময়িক মাত্র আর হিউম সাহেব বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিই চিরকালীন আশ্রয়।

কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ীতে কথোপকথন হইতেছিল।

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন—তোমার ধর্ম তো গেল।

আনন্দময়ী বলিলেন—যিনি ধর্ম দিয়েছেন তিনিই বাছাকে দিয়েছেন।

—এখন আচার বিচারের কি হবে?

—এবারে বিচার করে আচার করবো।

—আমার বিচারে কি বলে জানো? শুধু তোমার জাত যায়নি, তোমার ঠাকুরসুদ্ধ অপবিত্র হয়েছেন।

—উনি যে প্রেমের অবতার। উনি জাত বিচার করেন না বলেই বাছাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন। নইলে সাধ্য ছিল কি সেদিন ওকে সিপাইদের হাত থেকে রক্ষা করি।

—বেশ, বেশ, তোমার গৌরাঙ্গের পোষ্যপুত্রের নাম রেখো 'গোরা', ওতে ওর পিতৃকুলের পরিচয়টাও থেকে যাবে।

—সে দেখা যাবে।

—দেখো, যে কথা বলতে এসেছিলাম। ওকে পাদ্রীদের হাতে দিয়ে দিই।

—কেন ?

নইলে শেষে বিপদে পড়বো। সরকারের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হবে, চাকরি যাবে। এখনো সব স্বীকার করে পাদ্রীর হাতে দেওয়া ভালো।

অচিরজাত সেই শিশুকে পাদ্রীর হাতে দিতে হইবে এই আশঙ্কায় স্বভাবতঃ সহিষ্ণুতাময়ী আনন্দময়ী আবেগে কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"তোমার তো মনে আছে ছেলে হ'বার জন্য আমি কি-না করেছি, যে-যা বলেছে তাই শুনেছি, কত মাদুলি, কত মন্ত্র নিয়েছি, সে তো তুমি জানই। একদিন স্বপ্নে দেখলুম যেন সাজি ভ'রে টগর ফুল নিয়ে এসে ঠাকুরের পূজো করতে বসেছি, এক সময়ে চেয়ে দেখি সাজিতে ফুল নেই, ফুলের মতো ধবধবে একটি ছোট্ট ছেলে ; আহা, সে কি দেখেছিলুম, সে কি বলবো, আমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিতে যাবো আর ঘুম ভেঙে গেল। তার দশদিন না যেতেই তো ওকে পেলুম, সে আমার ঠাকুরের দান, সে কি আর কারো যে আমি কাউকে ফিরিয়ে দেবো। আর জন্মে তাকে গর্ভে ধারণ করে বোধ হয় অনেক কষ্ট পেয়েছিলুম, তাই আজ সে আমাকে মা বলতে এসেছে। কেন, পাদ্রীকে দিতে যাবো কেন ? পাদ্রী কি ওর মা-বাপ,

না, ওর প্রাণরক্ষা করেছে ?···তুমি যাই বলো, এছেলে যিনি আমাকে দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং যদি না নেন, তবে প্রাণ গেলেও আর কাউকে নিতে দিচ্ছি নে।"

মাতৃহৃদয়ের এই স্বসমুথ দাবীর বিরুদ্ধে কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া কৃষ্ণদয়াল নির্বাক হইয়া রহিলেন।

জেমি গ্রীনের আত্মকথা

আজ যে কাহিনী বলিতে বসিয়াছি তাহা জীবনীও বটে, ইতিহাসও বটে ; তারও চেয়ে কিছু বেশি, ইহা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক একটি গল্প। এমন কত-শত গল্পের ভাঙা টুকরা হিন্দুস্থানের মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে কে তাহার সন্ধান রাখে। কেহ সেগুলি সংগ্রহ করিলে, যত্ন করিয়া বিন্যস্ত করিলে ভারতজোড়া উপন্যাসের সৌধ হইতে পারে। তেমন শিল্পসাধ্য আমার নাই, আমি ছোট টুকরা সংগ্রহ করিয়াছি। এই কাহিনী-খণ্ডটি এমনই অসাধারণ যে, ইহার উপরে কারিগরি করিবার প্রয়োজন নাই, যেমন আছে তেমনি পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি, ইহার অসামান্যতা নিতান্ত অনবধানীর পক্ষেও অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময়। সিপাহীবিদ্রোহকে রাজনীতিকগণ নব্য ভারতের প্রথম জাতীয় চিত্তবিক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করেন, সব ঐতিহাসিক ইহার সে দাবী সমর্থন করেন না। ঐতিহাসিকগণের মতে সিপাহী-বিদ্রোহকে সচেতন জাতীয় আন্দোলন বা গণবিক্ষোভ বলা চলে না। বিশেষজ্ঞগণের তর্ক-বিতর্কের দুর্গম মতসঙ্কটে প্রবেশের ক্ষমতা আমার নাই, সে প্রয়োজনও বোধ করি নাই। ইহা নব্য ভারতের প্রথম জাতীয় চিত্তবিক্ষেপ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে মুঘল ভারতের শেষ রাষ্ট্রীয় চিত্তবিক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের অধিকাংশ নেতার কার্যকলাপ এই মতেরই সমর্থক। তবে ব্যতিক্রমও আছে। আজ যাঁহার কথা বলিতে বসিয়াছি তিনি এক ব্যতিক্রম।

ইংরাজি-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশজাত এই যুবক সচেতন প্রয়াসে কোম্পানী রাজত্ব উৎখাত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আংশিক ফলিয়াছিল। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করে নাই, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের পরিণামে কোম্পানীর রাজত্বের সত্যই অবসান ঘটিয়াছিল। দীর্ঘ ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন, ইহার আত্মকথা শুনিলে নব্য ভারতবাসী তাহাকে মুহূর্তে আপনার কথা বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

২

কথারম্ভ

১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। স্যার কলিন ক্যাম্পবেলের অধীনে বৃটিশ সৈন্য লখনৌ অধিকার করিতে চলিয়াছে। কানপুর হইতে লখনৌ চল্লিশ মাইল পথ। বৃটিশ সৈন্য কানপুরে গঙ্গা পার হইয়া লখনৌ মুখে উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছে। বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগামী দলের ঘাঁটি আলমবাগ লখনৌ শহরের উপকণ্ঠ, তিন মাইল দক্ষিণে। কানপুর হইতে আলমবাগ পর্যন্ত ভূখণ্ড বৃটিশ পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ প্রভৃতির চলাচলে ব্যস্ত। মাঝখানে উনাও শহর। এখানে একটি বড় ঘাঁটি। এখানে অনেক তাঁবু পড়িয়াছে, কিছুদূরে অস্থায়ী বাজার বসিয়া গিয়াছে, সৈন্যবাহিনী তাঁবু গাড়িলে যেমন বাজার বসে তেমনি। এই কাহিনীর দুইজন নায়ক, প্রথম নায়ক ফরবেস-মিচেল, ৯৩ নম্বর হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্টের একজন সার্জেণ্ট, প্রধান নায়ক পূর্বোক্ত যুবক। ফরবেস-মিচেল শহরের একটি বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। সন্ধ্যা আসন্ন।

সে একাকী বসিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল—

আশ্চর্য ঐ লোকটা জেমি গ্রীন, যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবেশ, তেমনি সুশিক্ষিত। ওকে কেক বিক্রি করতে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম কোন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে অভাবে পড়ে ফিরিঅলার কাজ করছে। কিন্তু লোকটা বললে কি না সে ইংরেজ, নাম জেমি গ্রীন। ওর ইংরেজী ভাষা আর উচ্চারণ শুনে অবিশ্বাস করা কঠিন, কোন দেশী লোককে এমন ইংরেজি বলতে শুনি নি। কেবল যে ব্যাকরণ শুদ্ধ তা নয় ভাষার মারপ্যাঁচ সব জানে। আর উচ্চারণ! বই প'ড়ে তো উচ্চারণ শেখা যায় না। প্রথমে সন্দেহের বশে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধের সময়ে কত অভিসন্ধি নিয়ে কতলোক আসে, জিজ্ঞাসা করতেই হয়—পাশ ঠিক আছে তো? সে অমনি পকেট থেকে পাশ বের করে বল্‌ল, সার্জেণ্ট সাহেব পরীক্ষা করে নাও, খোদ ব্রিগেডিয়ার এড্রিয়ান হোপ সাহেবের হাতের অক্ষর কিনা।

তাই তো বটে। ব্রিগ্রেডিয়ার হোপ ৯৩ নম্বরের কর্নেল, তাঁর হস্তাক্ষর সবাই চেনে!

কিন্তু এখানে কেন?

কি করবো সাহেব, যেখানে রুটি সেখানে জুটি।

সবই যেন বুঝলাম কিন্তু এমন ইংরেজি শিখলে কোথায়? তুমি তো ইংলণ্ডে যাও নি।

সাহেব আমরা দুপুরুষের ফৌজী মেস খানসামা। আমার বাবা ছিল ৮২ নম্বর রেজিমেণ্টের খানসামা, পরে আমিও কিছুদিন ছিলাম। তারপরে রেজিমেণ্টটা পাঞ্জাবে চলে গেলে আমি আর যাই নি।

তারপরে একটু হেসে বলল, সাহেব গ্রামার-স্কুলে আর ইংরেজি ভাষার কতটুকু শেখা যায়? ওখানে ইংরেজি সরস্বতীর তো গাউনপরা মূর্তি। ভাষা শিখতে হয় তো ফৌজী মেস। দেখি সাহেব কাগজগুলো।

এ বিলাতী কাগজ, এতে তোমার দরকার কি?

সাহেব, যে দেশ বাপের জন্মে দেখলাম না তার খবর জানতে বড্ড ইচ্ছে করে।

খবরের কাগজগুলো নিয়ে উল্টে পাল্টে লোকটা যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো।

এমন সময়ে ঘরের বাইরে গোলমাল শুনে তাকিয়ে দেখি জেমি গ্রীনের কেকের বাক্সবাহী চাকরটার সঙ্গে ফৌজী লোকদের বচসা আরম্ভ হয়েছে।

এমন বীভৎস চেহারার লোক আগে দেখি নি। জেমি গ্রীন যেমন সুপুরুষ, লোকটা তেমনি পাষণ্ডাকৃতি, জুটেছে ভালো, দেবদূতের সঙ্গে শয়তান।

লোকটা বলছে ফৌজী আদমিরা কেক খেয়েছে, এখন দাম দিতে নারাজ।

আমি কিছু বলবার আগেই জেমি গ্রীন বলে উঠল, ভাইসব, ঠাট্টা ঠাট্টা, কিন্তু কেক খেয়ে দাম না দেওয়া বোধ করি হাইল্যাণ্ডী ঠাট্টা।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। ব্যাপারট তখনি মিটে গেল।

শুধোলাম, জেমি গ্রীন এই বস্তুটিকে সংগ্রহ করলে কোন্ জাহান্নাম থেকে? কোন্ দিন তোমাকেই খুন করবে, যা চেহারা।

সাহেব, জাহান্নাম কি আর দূরে কোথাও আছে। কানপুরে ওকে পেলাম। সব লোক তো এসব মেহনতী কাজে আসতে চায় না। লোকটা খুব খাটিয়ে। শরীরটাও মজবুত, কখনো অসুখ-বিসুখ করতে দেখি নি।

ওর পরিচয় কি?

ও তো বলে ইংরেজ।

ইংরেজ? এমন পাকা আবলুশের রং হ'ল কি ক'রে?

ওর মা নেটিভ খৃষ্টান।

বাপ?

নাম বলতে পারে না, একটি তো নয়।

একটি নয়?

না, রেজিমেণ্টের সবাই, মায় খানসামা অবধি সেই গৌরব দাবী ক'রে থাকে।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

নাম?

মিকি। আচ্ছা সাহেব এবারে আসি।

'টাটকা তাজা কেক' হাঁকতে হাঁকতে জেমি গ্রীন ও মিকি বিদায় হ'য়ে গেল।

ফরবেস-মিচেলের চিন্তাসূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছিল কামানের আওয়াজে। উত্তর দক্ষিণ দুই দিক থেকেই আসছিল কামানের শব্দ, সমান দূরত্ব তাই সমান অস্পষ্ট। উত্তরে আলমবাগে জেনারেল উট্রামের কামানের ধ্বনি, আর দক্ষিণে স্যার রবার্ট নেপি-য়ারের কামানের আওয়াজ কানপুরে।

কিন্তু তার আজকার অভিজ্ঞতা এমনি অভিনব যে চিন্তার ছিন্নসূত্র তখনই জোড়া লেগে যাচ্ছিল, আর সে কেবলি ভাবছিল—আশ্চর্য ঐ লোকটা জেমি গ্রীন।

এমন সময়ে অদূরে 'গোয়েন্দা', 'গোয়েন্দা' রব শুনতে পেলাম। ঐ রবের সঙ্গে আজকাল খুব পরিচিত হয়েছি। যেখানে বৃটিশবাহিনী সেখানে চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোয়েন্দা এসে হাজির হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছাকাছি যত গাছ আছে সেগুলোর ডালে তাদের মৃতদেহ ঝুলতে থাকে। অবশ্য আমাদের গোয়েন্দাদেরও ঐ অবস্থা হয় বুঝতে পারি! দুই পক্ষের মধ্যে এ লড়াই যে-ভাবে চলছে তাকে কশাইগিরি ছাড়া কি বলা যায়। দুই পক্ষই সমান নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে, না আছে বাছ না আছে বিচার।

গোয়েন্দা! গোয়েন্দা!

শব্দ এবার আমার ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হওয়ায় কৌতূহলী হ'য়ে বাইরে বেরুলাম। বেরিয়ে দেখি—একি? এ যে জেমি গ্রীন আর মিকি?

যে পাহারাওয়ালা ওদের বেঁধে নিয়ে এসেছিল বল্‌লে—এরা লখ্‌নৌর বেগমের গোয়েন্দা। দু'জনেই মুসলমান। কর্নেল সাহেব বিচার করেছেন, কাল ভোরে ওদের লটকিয়ে দেওয়া হবে। কর্নেল সাহেবের হুকুম আজ রাতটা ওরা আপনার জিম্মায় থাকবে।

আবার মনে হ'ল আশ্চর্য ঐ লোকটা জেমি গ্রীন।

ওরা মুসলমান শুনবামাত্র কয়েকজন সৈন্য বলে উঠল, নিয়ে এস তো বাজার থেকে খানিকটা শুওরের মাংস, হতভাগা দুটোর মুখে গুঁজে দি, জাহান্নামে যাবার আগে বস্তুটার স্বাদ পেয়ে যাক্, কখনো তো পায় নি।

আমি বল্‌লাম, সাবধান, বন্দী আমার জিম্মায়। যে ওরকম অসভ্যতা করবে তার চাপরাশ উর্দি খসিয়ে নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করবো।

আমার কথা শুনে লোকগুলোর উৎসাহ দমে গেল; যে যার কাজে চলে গেল। জেমি গ্রীন আর মিকিকে ঘরের মধ্যে তুললাম।

অপমানের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় সে আমাকে ধন্যবাদ দিল, বলল, সার্জেণ্ট সাহেব, অনেক ধন্যবাদ, খোদা তোমার ভালো করবেন।

সে আরও বললে,—গ্রেপ্তার হ'বার পরে মনের মধ্যে অনেকখানি আগুন নিয়ে এখানে এসেছিলাম। তোমার সদয় ব্যবহারে তার কতক নিভ্‌ল! লালমুখো ইংরেজের কাছে এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। আরও একবার আর একজন ইংরেজের কথায় মনে এমনি ভাবের উদয় হয়েছিল।

সে একটি ঘটনার উল্লেখ করলো। সে বলল, কানপুরে গঙ্গার উপরে বৃটিশ যে নৌকোর পুল বানিয়েছে তার রক্ষার জন্যে নিকটবর্তী একটা শিবমন্দির ধ্বংস করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। কর্নেল নেপিয়ার যখন সেই মন্দিরটা উড়িয়ে দেবার আয়োজন করেছে তখন একদল ব্রাহ্মণ এসে বলল—হুজুর ঐ মন্দিরটা রক্ষা করুন।

নেপিয়ার বলল, দেখো, তোমাদের স্পষ্ট করে একটা কথা বলি। তার আগে বলে নিই যে, এ মন্দিরটার উপরে আমাদের রাগের কোন কারণ নেই, তবে পুল রক্ষার জন্য ওটা ধ্বংস করা দরকার। কিন্তু তাতেও না হয় মন্দিরটা ছেড়ে দিতে পারি যদি তোমরা আমার প্রশ্নের সত্য উত্তর দাও।

নেপিয়ার বলল,—কিছুদিন আগে বিবিঘরে বহু ইংরাজ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাকে হত্যা করা হ'য়েছে। তখন তোমরা সকলেই এখানে ছিলে। তোমাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছে যে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে? এমন একজনও কি আছে যে তাদের হ'য়ে দুটো কথা বলেছিলে, বলেছিলে অসহায় নারী ও শিশু হত্যা করা পাপ? যদি তোমরা বলো যে হাঁ আমি বলেছিলাম, সিপাহীপক্ষ শোনে নি, তাতেই আমি খুশী হ'ব—মন্দির বেঁচে যাবে। ব্রাহ্মণের দল মুখ নীচু ক'রে চলে গেল। কি আর বলবে। নেপিয়ার হুকুম করলেন, বারুদে আগুন দেওয়া হ'ল—গুম, মন্দিরের ভাঙা ইঁট কাঠ আকাশে লাফিয়ে উঠল।

সে বলল, আমি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, সব শুনলাম, সব দেখলাম। মনে মনে নেপিয়ারকে প্রশংসা করলাম।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে গ্রীন বলল,—সার্জেণ্ট, তোমার কথায় আজ আমার ফাঁসির আসামীর মনটা শান্ত হ'ল। খোদার কাছে শান্তভাবে যেতে পারবো, গিয়ে আবার তোমার ভাল করবার জন্য আরজি করবো।

তার এই ধন্যবাদের বদলে আমি তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে আদেশ করলাম। সে খুশী হ'য়ে নমাজ পড়তে লাগল। অবশ্য পাষণ্ডদর্শন মিকির বাঁধন খুলে দিতে সাহস করি নি, আর সে বোধ করি নমাজ পড়বার জন্যে ব্যস্তও ছিল না। সে এক পাশে মুখ গোঁজ ক'রে বসে খুব সম্ভব মনে মনে আমার মুণ্ডপাত করছিল।

ওর নমাজ পড়া শেষ হলে আমি একজন পাহারাওয়ালাকে বাজার থেকে একজন মুসলমান হোটেলওয়ালাকে ডেকে আনতে বল্‌লাম। হোটেলওয়ালা এলে বল্‌লাম, এরা দুজন যা খেতে চায় দাও, আমি খরচ দেবো।

হোটেলওয়ালা বল্‌ল, সে কি কথা সাহেব! এই ফাঁসির আসামীরা মুসলমান, আজ তাদের খানা জুগিয়ে দাম নেবো? আর আপনি যদি দিতে পারেন তা আমরা কি দিতে পারি নে? না, দাম দেওয়া চলবে না।

জেমি গ্রীন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খানা খেয়ে আয়েস করে তামাক টেনে স্থির হয়ে বসলে আমি তাকে বললাম, জেমি গ্রীন, তোমাকে শিক্ষিত ভদ্রবংশজাত ব্যক্তি বলে মনে হয়, তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে কেন? নিশ্চয় এই হীন বৃত্তির সঙ্গে অনেক ক্ষোভ আর অনেক রহস্য জড়িত। সরলভাবে তোমার জীবনকথা আমাকে বলো— আমি লিখে আমাদের দেশের কাগজে ছাপবো।

খুব উপকার হবে সাহেব, কারণ লণ্ডন ও এডিনবরায় আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছে।

লণ্ডন ও এডিনবরায়? তোমার বন্ধু?

আশ্চর্য্যবো[illegible]? আমার জীবনকথা শুনলে বিস্ময়ের নিরসন হবে। আমার বিদেশী বন্ধুরা আমাকে গোয়েন্দা বলে জানবে এর চেয়ে দুঃখের আর কি হ'তে পারে?

তুমি কি গোয়েন্দা নও?

সাধারণত গোয়েন্দা বলতে যা বোঝায় আমি তা নই, তবে আমি সিপাহীপক্ষের লোক বটে। আমার জীবনকথা শুনলে বুঝতে পারবে কেন আমি কোম্পানীর চাকুরে হয়েও বিদ্রোহীপক্ষে যোগ দিলাম! বুঝতে পারবে কোন্ ক্ষোভ, কোন্ জ্বালা আমাকে চাকুরির মায়া ছাড়িয়ে এমন আত্মনাশের পথে টেনে আন্‌লো। আর বুঝতে পারবে কি না জানি নে, এই জ্বালা, এই ক্ষোভ, কেবল আমার একার নয়, আমার মতো ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকেরই। সাহেব একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আসন্ন মৃত্যুকালে বোধ করি ভবিষ্যতের জানলা দরজা একটু ফাঁক হয়ে যায়, যেদিন ইংরাজি-শিক্ষিত লোকে তোমাদের প্রতি বিরূপ হবে সেদিন তোমাদের হিন্দুস্থানের মসনদ টলবে। গোঁয়ার সিপাহীদের সাধ্য কি সে আসন টলায়। দেশময় আজ যে কাণ্ড চলেছে এ হচ্ছে পুরনো হিন্দুস্থানের অন্তিম বিকার; এ ঝড় কেটে গেল; কিন্তু যে ঝড়ে তোমাদের হিন্দুস্থান ছাড়া করবে, তার কেন্দ্র হচ্ছে বেরিলি কলেজের মতো নয়া তালিম। সেদিনকার সেই ঝড়ের আকর্ষণে তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে। তখন জানবে তোমাদের আসন টলল। বোধ করি সেদিন ভালো করে জানবারও অবকাশ পাবে না, সমস্ত এক লহমায় হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

সে যখন এই কথাগুলো বলছিল আমি স্থির করেছিলাম আজ রাতটা জেগেই কাটাবো। প্রথমত তার কাহিনী শোনবার কৌতূহল, দ্বিতীয়ত জেগে থাকলে চোখের উপরে রেখে তাকে খানিকটা মুক্ত রাখতে পারবো। নয় তো হাত পা বেঁধে ফেলে রাখতে হয়। তাই সারারাত্রি জাগবার উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে বসলাম। বললাম, জেমি গ্রীন, আমার কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে, বলো, তোমার নাম, ধাম, বংশপরিচয়, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি?

সে শুরু করলো।

আমার নাম মহম্মদ আলি খাঁ, রোহিলখণ্ডের এক অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান জায়গীরদার পরিবারে আমার জন্ম। আমি বেরিলি কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করি। সেখানকার শেষ পরীক্ষায় আমি প্রথম হলাম, দেশী ও ইংরেজ সব ছাত্রের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছিলাম। এবারে প্রশ্ন হল—এখন কি করবো? চাকুরিতে ঢুকবো কি? বাবা বললেন যে, কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করো। তিনি বললেন, রাজত্ব কোম্পানীর, এখন মান সম্মান টাকাকড়ি কোম্পানীর চাকুরিতে। কোম্পানীর চাকুরি নাও।

তাই নিলাম, কোম্পানীর ফৌজী এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করলাম। সেই থেকে আমার পরীক্ষা আরম্ভ হল। ভাগ্যের কি লীলা। এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের জমাদার নিযুক্ত হলাম আমি, আর আমার উপরওয়ালা হল এক ইংরেজ, বিলেতে থাকলে যে মিস্ত্রী ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না। কেন এমন হল? না আমি দেশী লোক। আমার গুণপনা যতই হোক একজন আকাট মূর্খ ইংরেজের উপরে ওঠবার আমার শক্তি হল না। আর সে লোকটার কি দম্ভ আর অবহেলা। প্রতি মুহূর্তে সে বুঝিয়ে দিত যে সে ইংরেজ আর আমি নেটিভ। অল্পদিনেই আমার মন বিষাক্ত হয়ে উঠল প্রথমে তার উপরে, তারপরে কোম্পানীর ব্যবস্থার আর তার রাজত্বের উপরে! সাহেব, আজ যে পথে আমায় দেখেছ সে পথে টেনে এনেছে কে? ঐ লোকটার মত দম্ভী ইংরেজ। এ কেবল আমার একলার অভিযোগ নয়—আমার মত ইংরেজী-শিক্ষিত সমস্ত ভারতীয়েরই অভিযোগ। তবে সকলে হয়তো অসন্তোষ প্রকাশ করে না, হয়তো সুযোগ পায় না, হয়তো সাহস পায় না। কিন্তু তাই বলে যদি ধরে নাও যে তারা সুখে আছে তবে মস্ত ভুল করবে। জলের চাপে বাঁধ কি একদিনে ভাঙে? চাপ প্রতি মুহূর্তে পড়ছে, ঠিক কখন ভাঙ্গবে তা কে বলতে পারে। এ বিদ্রোহ সেই বাঁধভাঙার তাণ্ডব। এইজন্যেই বলেছিলাম

যে কোম্পানীর মসনদ টলবে যখন ইংরেজিশিক্ষিত দেশী লোক বিদ্রোহ করে বসবে। কোম্পানী যদি ইংরেজি শিক্ষা না দিত এ দেশে কখনো বিদ্রোহ হত না। তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষাই বিকৃত হয়ে উঠে একদিন তোমাদের এ দেশ ছাড়া করবে। আজ কি সেই দিন এসেছে?

এই বলে কিছুক্ষণ মহম্মদ আলি খাঁ চুপ করে বসে রইলো, তারপরে আবার আরম্ভ করলো—

বাবা সব অবস্থা শুনে চাকুরী ছেড়ে দিতে উপদেশ দিলেন। কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম। আবার প্রশ্ন হল এখন কি করি? চললাম লখনৌর দিকে, নবাব নসরুদ্দিনের সরকারে চাকুরী নেবার আশায়। লখনৌ গিয়ে শুনলাম নেপালের মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর গোরখপুরে এসেছেন, তিনি শীঘ্রই বিলাত যাবেন, চান একজন ইংরেজি-জানা সেক্রেটারী। তাঁর কাছে গিয়ে দরখাস্ত করলাম, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়ে আমাকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করলেন। চললাম ইংলণ্ডে। সেখানকার একটি ঘটনায় সাহেব তুমি নিশ্চয় কৌতূহল অনুভব করবে। এডিনবরায় জঙ্গ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করবার যে আয়োজন হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ৯৩ নম্বর হাইল্যাণ্ডের রেজিমেণ্ট! তখন কে জানতো যে তাদেরই একজনের উপরে ভার পড়বে আমার জীবনের শেষ রাত্রি পাহারা দেবার।

জেমি গ্রীন তার আত্মকথা বলে যাচ্ছিল আর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে প্রহর বেজে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত কয়টি ক্রমে সংক্ষিপ্ততর হয়ে আসছে।

তারপরে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে কয়েক বছর বিভিন্ন দেশী রাজা আর নবাবদের সরকারে চাকুরী করলাম। শেষে দেখা হ'ল আজিমুল্লা খাঁর সঙ্গে। তার কথা নিশ্চয় শুনেছ, এখন সে বিদ্রোহের একজন পাণ্ডা, নানা সাহেবের ডানহাত। তখন সে ছিল নানা সাহেবের এজেণ্ট। আমি আগে ইংলণ্ড গিয়েছি শুনে আমাকে সে সঙ্গে নিল। তার বিলাত যাবার উদ্দেশ্য ছিল লর্ড ডালহৌসির যে ফর্মানবলে নানা

গদিচ্যুত হ'য়েছিল ইংলণ্ডে গিয়ে পার্লামেন্টের মেম্বরদের কাছে দরবার ক'রে তা নাকচ করা। সাহেব একটা বিষয় ভেবে দেখো, এ দেশের লোক কোম্পানীর উপরে যতই বিরক্ত হোক না কেন ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার উপরে খুব তাদের ভরসা। যেদিন এ ভরসা তাদের যাবে, তারা বুঝবে এ দেশের কোম্পানী আর ওদেশের পার্লামেণ্ট একই ব্যবস্থার ডান হাত বাঁ হাত সেদিন এ দেশ থেকে তোমাদের রুটি উঠল। সাহেব আজিমুল্লা খাঁ নিতান্ত মুন্সী লোক, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে তার ভরসার অন্ত নেই। তার বিশ্বাস একজনে যদি ফর্মান দিতে পারে, আর একজনে তা নাকচ্ করতে পারবে না কেন? সে বিশ্বাস যখন ভাঙ্গে তখন এই সব মুন্সী লোক ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের বিদ্রোহের তুলনায় এই সব গাঁওয়ার সিপাহীদের বিদ্রোহ ছেলেখেলা।

আচ্ছা ইংলণ্ডে গিয়ে তোমরা কি করলে?

সে ইতিহাস বিস্তারিত ব'লে লাভ নেই। মোটের উপরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড খরচ হ'ল। বৈঠকখানায় আর মজলিশে আমাদের আদর অভ্যর্থনার অন্ত রইলো না। কিন্তু আসল কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ। আশ্চর্য জাত তোমরা সাহেব, সামাজিক আসরে তোমরা ভদ্রতার অবতার, আফিসের চেয়ারে একটি পাথরের মূর্তি। এইজন্যেই লোকে তোমাদের জাত হিসাবে ভণ্ড বলে। হয়তো সে অভিযোগ ঠিক নয়, হয়তো ওইটেই তোমাদের জাতিগত প্রকৃতি। আবার ফিরলাম দেশের দিকে। এধারে এলাম ইস্তাম্বুল হ'য়ে। গিয়েছিলাম ক্রিমিয়ায়, তখন সেখানে রুশের সঙ্গে তোমাদের লড়াই চলছে। একটা যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় দেখে ভাবলাম তবে তো এরা অজেয় নয়। ভাবলাম রাশিয়ানদের হাতে যদি হারে ভারতীয়দের হাতেই বা হারবে না কেন? এমন সময়ে একজন রাশিয়ান এজেণ্টের সঙ্গে আজিমুল্লা খাঁর পরিচয় হ'ল। আমাদের মনোভাব জেনে সে বলল, তোমরা বিদ্রোহ কর না কেন? দেখছ তো ওদের বীরত্ব। তার কথা শুনে আজিমুল্লা খাঁর মনে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রথমে

এলো! আজিমুল্লা স্থির করলো প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করতে হবে আর কোম্পানীর বনিয়াদ উপড়ে ফেলতে হবে।

তারপরে জেমি গ্রীন একটুখানি নীরব থেকে বলতে লাগলো,—এবারে যেন আমাকে নয়, নিজেকেই—সেই বিদ্রোহ ঘটেছে, আর ঐ যে কিছুক্ষণ আগে বিলাতী খবরের কাগজগুলো পড়লাম তা থেকেই জানতে পেরেছি কোম্পানীর বনিয়াদও আলগা হয়ে গিয়েছে, পার্লামেণ্ট এবারে নিজ হাতে শাসনভার নেবে। কোম্পানী গেল, ইংরেজ গেল না। হয়তো এতে দেশের ভালই হবে। ভালই হোক আর মন্দই হোক, একশ বছর। কোম্পানী একশ বছর সময় পেয়েছিল, পার্লামেণ্টও একশ বছরের বেশী সময় পাবে না।

এর পরের কথা সবাই জানে সাহেব, তুমিও জানো। মীরাট, বেরিলি, কানপুরে আগুন জ্বলে উঠল। আমি ভাবলাম এ সুযোগ ছাড়া নয়। এমন সময়ে শুনলাম সিপাহীরা দিল্লী গিয়ে বাহাদুর শাহকে আবার হিন্দুস্থানের মসনদে বসিয়েছে। স্থির করলাম দিল্লীতেই আমার স্থান, সেখানে নিশ্চয় এঞ্জিনীয়ারের দরকার আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদে রাখা আবশ্যক। তাদের নিয়ে গেলাম রোহিলাখণ্ডের সুদূর এক গ্রামে। তারপরে চললাম দিল্লীর দিকে।

একটা কথা বলবে? কানপুরের বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড কি দেখেছ?

না, সে সময়ে আমি রোহিলাখণ্ডে গিয়েছি স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে।

আচ্ছা, একথা কি সত্য যে মেয়েদের হত্যা করবার আগে তারা ধর্ষিত হয়েছিল?

সাহেব এদেশের লোককে তোমরা জানো না, তারা নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু পাশব কখনো নয়।

এ হত্যাকাণ্ডের আসল কারণটা কি?

আমি যতদূর জানি নানার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাকে অনিবার্যভাবে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলাই এর উদ্দেশ্য, যাতে নানা আর পিছিয়ে যেতে না পারে।

কে এর নেতা ছিল? আজিমুল্লা খাঁ?

হয়তো সে ছিল। কিন্তু আসল নেতা নানার হারেমের এক বাঁদী, জুবেদী তার নাম।

স্ত্রীলোক?

বিস্মিত হয়ো না সাহেব। স্ত্রীলোক-দানবের মতো দানব আর কোথায়?

এসব শুনলে কার কাছে?

তাঁতিয়া টোপির কাছে, বিবিঘরের কাণ্ডের পরে নানার সঙ্গ ছেড়ে সে চলে যায়।

হত্যা করলো কারা? নানার সৈন্যদল?

না, তারা শ্রেফ অস্বীকার করেছিল।

তবে?

ঐ দানবীটা টাকার লোভ দেখিয়ে জনকতক কশাইকে সংগ্রহ করেছিল।

হত্যাকারীদের একজনের বর্ণনার সঙ্গে তোমার ঐ মিকির বড্ড বেশি মিল। জানো কিছু?

নিশ্চয় জানি না। তবে হ'লে আশ্চর্য হব না।

তবে ওকে তোমার অনুচর করলে কেন?

আগে সন্দেহ হয় নি, পরে শুনেছি।

তখন ওকে পরিত্যাগ করলে না কেন?

তখন আর উপায় ছিল না। ছাড়া পেলেই ও গিয়ে আমাকে ধরিয়ে দিত। সাহেব আলকাতরায় হাত দিলে হাতে কালি লাগবেই। মিকির সঙ্গদোষে আমার সব শুভ সঙ্কল্প মলিন হয়ে গিয়েছে। হয়তো সেই অপরাধেই, আজ এই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়লাম।

যাক্, এবার যা বলছিলে বলো।

স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদে রেখে দিল্লী গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সেনাপতি বখ্‌ত খাঁ আমাকে জানতো, তার ইচ্ছাতে আমি বাদ্‌শাহী ফৌজের চীফ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়ে কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু কাজ করবার

কি উপায় আছে ? সৈন্যদের মধ্যে কোন নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, শহরে কোন ব্যবস্থা নেই। আর কে যে কর্তা, কজন যে কর্তা স্থির নেই। প্রত্যেক বাদশাজাদা আসে, একবার ক'রে হুকুম ক'রে যায়। সকলেরই মাতব্বরি করবার শখ, কিন্তু সাধ্য কারো নেই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখনই বুঝলাম। হ'লও তাই।

বাদশার অবস্থা কিরকম ?

ওরকম সিংহাসনের চেয়ে জেল ভালো, তাতে জায়গা কিছু বেশি, হাত পা নাড়বার সুযোগ আছে।

তাঁর বাদশাহী করবার শক্তি কিরকম ?

সে একবার কপালে হাত ঠেকালো, বললো, জীর্ণ নৌকোয় সমুদ্র পার হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তাঁর পক্ষেও হিন্দুস্থানের বাদশাহী করা সম্ভব।

তিনি কি বিদ্রোহের মূলে ছিলেন ?

সমস্ত শাহাজানাবাদে তাঁর চেয়ে নিরীহ নির্দোষ কেউ ছিল না।

তার পরে ?

বৃটিশ ফৌজ দিল্লী অধিকার ক'রে নিলে বাদশাজাদা, ফেরোজ্ শা, সেনাপতি বখ্ত খাঁ আর আমি যমুনা পার হ'য়ে মথুরায় চলে এলাম। তখনো আমাদের অধীনে ত্রিশ হাজার ফৌজ ছিল।

থানার ঘড়িতে তিনটা বাজলো। মিকি এক কোণে আগের মতো মুখ গুঁজে ব'সে আছে, হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়েছে।

সাহেব আমার সময় ফুরিয়ে এলো, হয়তো আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাক পড়বে। তার আগে তোমাকে ব'লে সব চুকিয়ে দিই। তুমি লিখবে বল্ছ, যার চোখে পড়বে সে বুঝবে মহম্মদ আলি খাঁ গোয়েন্দা ছিল না, ছিল বাদশাহী ফৌজের চীফ এঞ্জিনিয়ার।

আমার সঙ্গীরা অন্য দিকে গেল। আমি গেলাম লখ্নৌ, সেখানে গিয়ে নবাবী ফৌজের চীফ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হ'লাম। লখনৌতে ফৌজের অবস্থা ও ব্যবস্থা দিল্লীর চেয়ে ভালো, কিছু কাজ করবার উপায় ছিল। সেকেন্দ্রাবাগ আর শাহনজফ-কে কেন্দ্র ক'রে দুর্ভেদ্য

প্রতিরোধ গ'ড়ে তুললাম। নভেম্বর মাসে সে বাধা অতিক্রম করতে তোমাদের হিমসিম খেতে হ'য়েছিল।

খুব মনে আছে। তাই বলো, সে লাইন তুমি গড়েছিলে। আমরা সে-সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রেছিলাম নিশ্চয় কোন ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারের কাজ। কথাটায় অনেকেই বিশ্বাস করেছিল, কারণ একটা জনশ্রুতি আছে যে, শাদা চামড়ার কোন কোন লোক সিপাহী দলে যোগ দিয়েছিল।

সে কথা একেবারে মিথ্যা নয়, কিন্তু ঘটনার ওসব ডালপালার মধ্যে প্রবেশ করলে আসল কথা আর শেষ হ'য়ে উঠবে না।

শুধু একটা প্রশ্ন। বৃটিশ সৈন্য যখন আক্রমণ করছিল তুমি কোথায় ছিলে?

শাহনজফের উপরে। আর তুমি?

শাহনজফের নীচে।

আজ তুমি উপরে, আমি নীচে।

জেমি গ্রীন, কে উপরে কে নীচে তার চূড়ান্ত স্থির কি এখানে হয়? যাক্ তারপরে তোমার কথা বলো।

বৃটিশ সৈন্য লখ্‌নৌর অবরোধ মোচন করতে পারলো না, কেবল রেসিডেন্সির অধিবাসীদের নিয়ে চলে এলো। লখ্‌নৌর সকলে জয়ের আনন্দে মগ্ন হ'ল। আমি বললাম—আনন্দ করবার সময় আসে নি। বৃটিশ সৈন্য আবার আসবে। এবারে অনেক বেশী প্রস্তুত হ'য়ে, অতএব কালব্যাজ না করে শহরের অবরোধ আরও দৃঢ় ক'রে তোলো। লেগে গেলাম সেই কাজে। করেওছি। এবারে লখ্‌নৌ শহরে গেলে জেমি গ্রীনকে তোমার মনে পড়বে। এমন সময়ে খবর এল, বৃটিশ সৈন্য শীঘ্রই কানপুর পরিত্যাগ করবে লখনৌ অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে।

এ সময়ে লখ্‌নৌ ছাড়লে কেন?

সেই কথাতেই আসছিলাম। শুনেছিলাম এবারে বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে অনেক শক্তিশালী কামান, অনেক আয়োজন। প্রস্তুতিটা কিরকম, দেখা দরকার মনে হ'ল।

গুপ্তচর পাঠালে না কেন ?

তারা কামানের শক্তির কি খবর রাখে ? বড় জোর সংখ্যাটা গিয়ে আমাকে জানাতে পারবে। তাই স্থির করলাম আমাকেই যেতে হবে। গেলাম কানপুরে। ফিরিওয়ালা সাজলাম, তখনই পেলাম মিকিকে ! হায়, কে জানতো, তখন আমি পাপের সঙ্গ নিলাম। যাই হোক, বৃটিশ তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে যা জানবার সব জানলাম। মনে হ'ল ফিরবার মুখে একবার উনাও শহরটা দেখে যাই। উনাও শহর ছেড়ে রওনা হবার মুখে একজন মুসলমান আমাকে চিনে ফেলল, বেরিলিতে থাকতে সে আমাকে চিনতো। তারপরে বিচার। তার পরে এখন আমি তোমার কাছে। এই তো আমার ইতিহাস। এবারে বলো মহম্মদ আলি খাঁ কি গুপ্তচর ?

জেমি গ্রীন, সে প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার আমি নেবো না। লিখবো তোমার কথা। ভবিষ্যৎ দেবে উত্তর, হয় তো সে উত্তরে তোমার অসম্মান হবে না।

এমন সময়ে থানার ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। ছ'টায় ফাঁসির সময় স্থির হয়েছে। কি বলবো ওকে ভাবছি এমন সময়ে জেমি গ্রীন বলে

ড

সাহেব সময় হ'য়ে এল, একবার শেষ নমাজ প'ড়ে নিই।

হাত মুখ ধুয়ে সে নমাজ পড়তে লাগলো।

সারা রাত্রি জাগরণে মিকি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নমাজ শেষ হ'লে জেমি তার মাথার লম্বা চুলের মধ্যে থেকে একটি সোনার আংটি বের করলো, বলল, আমার সঙ্গে আর যা কিছু ছিল বিচারের আগে সব নিয়ে নিয়েছে, এটার সন্ধান পায় নি।

তারপর আঙটিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, সাহেব এটা তুমি রাখো। না, না, অস্বীকার ক'রো না, এর দাম সামান্যই। ইস্তাম্বুলের একজন ফকির আমাকে দিয়েছিল, বলেছিল মন্ত্রপড়া এ আঙটির অসাধারণ ক্ষমতা, যার কাছে থাকবে তাকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করবে। কত বিপদ না আমি উদ্ধার পেয়ে গিয়েছি এই আংটির জাদুতে। কিন্তু

পাপীর সঙ্গ নিয়েছি ব'লে আঙটির জাদু এবারে আর খাটলো না, ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবে। লখ্নৌ সহরে গিয়ে এবার যখন মহম্মদ আলি খাঁর প্রস্তুত অবরোধের সম্মুখীন হবে, তখন মহম্মদ আলি খাঁর প্রদত্ত এই জাদু-আঙটি তোমাকে রক্ষা করবে। তুমি ভাবছ সাহেব শত্রুকে কেন দিলাম? কে শত্রু, কে মিত্র তা নিশ্চিতভাবে জানবো কি উপায়ে? আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়ে তোমার কাছে যে সদয় ব্যবহার পেলাম, এ কি শত্রুর কাছে প্রত্যাশিত? আমার মন স্নিগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। আজ আমার আর কি আছে? ওটা রাখো। মাঝে মাঝে চোখে পড়লে হতভাগ্য জেমি গ্রীনকে মনে পড়বে। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই, কোম্পানীর রাজত্বের উৎখাত চেয়েছিলাম, তা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কেবল—

এতক্ষণে সে যেন ভেঙে পড়ল, বলল—

কেবল স্ত্রী আর ছেলে দুটির কথা মনে পড়ছে। জানি তারা নিরন্তর আমার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করছে। আজ সকালে উঠে তারা যখন আমার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করবে, তখন আমার মৃত-দেহ ফাঁসিগাছে লম্বমান। তারা জানতেও পাবে না। কতদিন পরে খবর পাবে কে জানে? আল্লা হাকিম, তোমার মর্জির আমরা কি বুঝি!

অগত্যা আঙটিটা নিয়ে পকেটে রাখলাম।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন সৈন্য এসে ওদের দুজনকে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন উনাও পরিত্যাগ করবার সময়ে থানার কাছে একটা গাছে ওদের দেহ লম্বিত দেখতে পেলাম। জেমি গ্রীনের শেষ উক্তি মনে পড়লো, এতক্ষণে ওর স্ত্রী পুত্র নিশ্চয় ওর নিরাপত্তার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করছে। মনে পড়লো, আল্লা হাকিম, তোমার মর্জির আমরা কি বুঝি!

তারপরে ঘটনার চাপে জেমি গ্রীনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, মনে পড়লো ১১ই মার্চ 'বেগমকুঠি' আক্রমণের সময়ে। আমাদের ৯৩ নম্বর রেজিমেণ্টের হুকুম হল 'বেগমকুঠি' আক্রমণ করবার। বেগমকুঠি প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা, প্রতিরোধ লাইনের কেন্দ্র। তার প্রত্যেক জানলা, দরজা, কার্ণিশ সশস্ত্র সিপাহীতে পূর্ণ, ভিতরে কত সৈন্য আছে কে জানে।

আমরা বেগমকুঠির সম্মুখে এসে দেখি কুড়ি ফিট গভীর এক পরিখা। সেটা অতিক্রম করতেই আমাদের অনেক সৈন্য মারা পড়লো। কিন্তু বেগমকুঠিতে আর প্রবেশ করা যায় না। তখন স্থির হল যে, কামান দিয়ে দেয়ালের কতকটা উড়িয়ে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। কামান দিয়ে দেয়ালের কতকটা সহজেই উড়িয়ে দেওয়া গেল, তিন চারজন মানুষ ঢুকতে পারে এমন ফুকর হয়েছে। কর্নেল আদেশ করলেন, চারজন সৈন্য চারটা বারুদের থলি নিয়ে ঐ ফুটো দিয়ে বেগম-কুঠির মধ্যে লাফিয়ে পড়বে, আর তারপর বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবে। এ নিশ্চিত মৃত্যুর আদেশ, কিন্তু যুদ্ধ তো আদর আপ্যায়ন মাত্র নয়, এমন আদেশ প্রয়োজন হলে দিতে হয়। চারজন বারুদের থলি পিঠে বেঁধে, ইসারায় সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ঐ ফুটোর দিকে যাত্রা করলো। ঐ চারজনের মধ্যে আমি একজন। আমাদের লক্ষ্য করে বেগমকুঠি থেকে গুলী চলছে! তবু অনাহত ফুটোর কাছে এসে পৌঁছলাম। এবারে লাফ দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করতে হবে। জেমি গ্রীনের সেই আংটিটা আঙুলে ছিল, একবার সেটার দিকে তাকালাম। আর তখনই মনে পড়লো, হাইল্যাণ্ডের একটা পার্বত্য গ্রামে আমারও স্ত্রী এবং দুটি পুত্র আমার নিরাপত্তার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করছে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত পরেই···তারা জানতেও পাবে

না···কতদিন পরে জানতে পারবে কে জানে···এমন সময়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হুকুম করলো, জাম্প।

আর একবার জেমি গ্রীনের আঙটিটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে Jaws of death-এর মধ্যে লাফ মারলাম।

আমি কি করে বাঁচলাম জানি নে, আমার তিনজন সঙ্গীই মারা পড়লো।

লখনৌ সহর অনেককাল অধিকৃত হয়েছে, বিদ্রোহ অনেককাল প্রশমিত হয়েছে, আমি সৈন্যবাহিনী অনেককাল পরিত্যাগ করেছি, এখন আমি বৃদ্ধ, হাইল্যাণ্ডের নিজ গ্রামে বাস করছি। জেমি গ্রীনের আঙটি এখনো আমার অনামিকায় রয়েছে। মৃত্যুকালে এ আঙটি আমার পুত্রকে দিয়ে যাবো, আর তাকে বলে যাবো সে-ও যেন এ-আঙটি শেষ সময়ে তার পুত্রকে দিয়ে যায়।

জেমি গ্রীন গোয়েন্দা ছিল কিনা সে উত্তর ইতিহাস দিক, তবে আমার সিদ্ধান্ত আমি স্থির করে নিয়েছি। নতুবা মৃত্যুকালে তার আঙটি পুত্রকে দিয়ে যাবার সঙ্কল্প করতাম না। *

*Reminiscences of the Great Mutiny 1857-59 by Forbes-Mitchell.

কোকিল

অদূরে শত্রুসৈন্যের সন্ধান মিলিয়াছে, তাহারা আক্রমণ করিবার আগেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে। কামানবাহী গাড়ীগুলি যথাস্থানে সজ্জিত হইতে লাগিল, তাহাদের চাকার কঁ্যাচকোঁচ শব্দ উঠিতেছে, ফৌজের ভারী বুট জুতার মস্ মস্ শব্দ, বন্দুকে বারুদ ঠাসিবার খট্‌খট্ আওয়াজ, অশ্ববাহিনীর দ্রুত কঠোর ক্ষুরের ধ্বনি, সৈন্য-নায়কগণের আদেশের সংক্ষিপ্ত চকিত রব, বিচিত্র শব্দের একটা চাপা তুফান। প্রস্তুতি সমাপ্ত হইবামাত্র কয়েক মুহূর্ত পরে সম্ভাবিত রণক্ষেত্র নিস্তব্ধ ভাব ধরিল, হাজার দুই লোক অথচ একটিও শব্দ নাই। ঝটিকা-পূর্ব নিস্তব্ধতার মতো যুদ্ধ-পূর্ব নিস্তব্ধতা, উৎকণ্ঠায় পূর্ণ প্রগাঢ় প্রশান্তি।

এমন সময় অদূরে আম্রকুঞ্জ হইতে কোকিলের ডাক শ্রুত হইল—কু-উ, কু-উ! ঐ ধ্বনি যেন রশি ফেলিয়া নিস্তব্ধতার তলা সন্ধান করিতেছে—কু-উ, কু-উ!

'I say, who'd ha' thought o' the likes o' that? Blest, if it was not a damned old cuckoo!'

'It is, it is Wordsworth's 'wandering voice'—the companion of the spring-time of our youth.'

তখন স্থানকাল ভুলিয়া কথক দুইজন তন্ময় ভাবে বাল্যকালে শোনা সেই কুহুধ্বনি আর একবার শুনিতে লাগিল, তাহাদের মনে পড়িয়া গেল সুদূর মাতৃভূমির 'পল্লবঘন' পল্লীপথ, 'পাঠশালা পলায়ন', চিত্রপক্ষ পতঙ্গ ধরিবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটোছুটি, আর তারি মাঝে বালক-চিত্তকে উচ্চকিত করা অশরীরী কণ্ঠস্বর—কু-উ, কু-উ। আজ আবার এতকাল পরে অতিদূর বিদেশে, রণক্ষেত্রের অদূরে, যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেই পুরাতন কণ্ঠ, তেমনি অশরীরী, তেমনি অপূর্ব!—কু-উ কু-উ!

'I say, if it was not a damned old Cuckoo !'

'It is, it is Wordsworth's 'Wandering Voice !'

অনেকে ভাবিতে পারেন যুদ্ধক্ষেত্র ও যুদ্ধ-পূর্ব মুহূর্ত এমন কবিত্বের স্থবর্ণ সম্ভাবনাপূর্ণ নয়। কথাটি স্বীকার করিতে পারিলাম না। যুদ্ধ-পূর্ব মুহূর্তে মানুষের যাবতীয় চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় এমন প্রখর ও স্পর্শ-কাতর হইয়া ওঠে যে, পূর্বে অদৃষ্ট জগতের অনেক সৌন্দর্য্য, পূর্বে অবোধ্য জীবনের অনেক সত্য সহজগ্রাহ্য হইয়া পড়ে, মনে রাখিতে হইবে যে, গীতার ন্যায় দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এমনি একটি যুদ্ধ-পূর্ব মুহূর্ত বাছিয়া লইয়াছিলেন। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে আরও কিছু কারণ ছিল। কথক দুইজন প্যালিসার ও বিউস আহত সৈনিক, যুদ্ধে যোগ দিবার হুকুম তাহাদের ছিল না, সৈন্যদলের পিছনে আহতদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাহারা অবস্থান করিতেছিল, কাজেই কোকিলের কুহু শুনিয়া কিছু কবিত্ব করিলেও তাহারা করিতে পারে।

প্যালিসার ও বিউস অর্ধশায়িত ভাবে কোকিলের ডাক শুনিতেছে এমন সময়ে অশ্বপদ-শব্দে তাহারা চমকিয়া উঠিল, দেখিল একজন অশ্বারোহী আসিতেছে।

'হ্যালো জন, সংবাদ কি ?'

জন ঘোড়া হইতে নামিতে নামিতে বলিল, 'সিপাহীরা পিছু হটে গিয়েছে। জেনারেল হ্যাভেলক বললেন, ওদের আক্রমণ করে বৃথা সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কানপুরে পৌঁছাবার চেষ্টা করা দরকার।'

'উত্তম অভিপ্রায়।'

'আশা করি কানপুরে ইংরেজ মহিলা ও শিশুরা এখনো নিরাপদে আছে।'

'জেনারেল তো সেই রকম অনুমান করেন।'

'থ্যাঙ্ক, গড'—বিউস বলে।

তাহার স্ত্রী কয়েক দিনের জন্য আগ্রা হইতে কানপুরে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে আবার শুধাইল, 'আর আগ্রার খবর কি ?'

'আগ্রার দুর্গ এখনো আমাদের হাতে। আগ্রার ইংরেজ সমাজ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে আর সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে বলে নিশ্চিত খবর পাওয়া গিয়েছে।'

'থ্যাঙ্ক গড' বলিয়া নিশ্চিন্ত বিউস ঘাসের উপরে দেহ এলাইয়া দিল।

এমন সময়ে লেঃ জনের খানসামা চা লইয়া আসিল। চা-পান শেষ করিয়া জন জেনারেল হ্যাভেলকের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। বিউস ও প্যালিসার উদ্বিগ্ন মনে সেখানে আমবনের ছায়ায় শুইয়া রহিল, তখনো কোকিলটা ডাকিয়া চলিয়াছে—কু-উ, কু-উ, কু-উ, কু-উ!

বিউস—'কোকিলের ডাক শুনলেই আমার একটা funny ঘটনার স্মৃতি মনে প'ড়ে যায়।'

'খুবই স্বাভাবিক, কেননা আমাদের অনেকেরই বাল্য-জীবনের সঙ্গে কোকিলের স্মৃতি জড়িত।'

'এ ঠিক আমার বাল্যকালের স্মৃতি নয়, প্রথম যৌবনের—'

'বাইজোভ! বিউস, তুমি কি শেষে কোকিলের ডাক শুনে পদ্য-টদ্য লিখে ফেলেছিলে নাকি?'

অভিযোগের গুরুত্বে বিউস শিহরিয়া উঠিল—'থ্যাঙ্ক গুডনেস! প্যালিসার, তুমি বলতে চাও মানুষ খুন করেছি?'

'সেটা আর এমন গুরুতর কি, সেই উদ্দেশ্যেই তো আমরা এদেশে এসেছি। কিন্তু পদ্য-লেখা যে আর এক ব্যাপার, ওকাজ যারা পারে তাদের অসাধ্য কিছু নেই।'

'তুমি নিশ্চিন্ত হও, বন্ধু, আমি চুরি, প্রবঞ্চনা বা পদ্য লেখার অপরাধে অপরাধী নই।'

'সত্যিই নিরুদ্বিগ্ন হলাম, এখন বলো ব্যাপারটা কি?

'Funny এই জন্য যে কোকিলের ডাকের সঙ্গে একটা ছবি আঁকার স্মৃতি জড়িত।'

'ওটাও অপরাধ তবে পদ্যের মতো একেবারে দণ্ডযোগ্য অপরাধ

নয়। দেখো বিল, আমি আর্ট, টেম্পারেন্স ও প্যাসিফিজম এসব জিনিষকে সত্যই ভয় করি।'

'আমি ঐ সঙ্গে আর একটা জিনিষ যোগ ক'রে দিতে চাই, গল্প-স্রোতে বাধা দান।'

প্যালিসার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,বলিল—গুড হিট, এবারে বলো—'

—'সেবারে বসন্তকালে আমি লেক ডিষ্ট্রীক্‌টে বেড়াতে গিয়েছিলাম, একেবারে খাস ওয়ার্ডস্বার্থের দেশে। একদিন সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছি, শুনলাম কোকিল ডাকছে। কোকিলের ডাক বাল্যকালে আমার কাছে যেমন রহস্যময় ছিল এখনো তেমনি আছে, rather তখনো তেমনি ছিল বলা উচিত। কেন এমন হয় জানো, পাখীটার ডাক যত বেশি শোনা যায় তত বেশি পাখীটাকে দেখা যায় না। সত্য কথা বলতে কি কোকিল পাখী ক্বচিৎ দেখেছি। যাই হোক, ডাক শুনে ভাবলাম আজ পাখীটাকে দেখতে হবে, হাতে অখণ্ড অবসর। এ গাছ ও গাছ তাকাতে তাকাতে চলেছি। একটা গাছের কাছে এসে মনে হ'ল পাখীটা ওরই কোন পাতার আড়ালে লুকিয়ে ডাকছে। আমি চলেছি পাতার অন্ধিসন্ধির দিকে চোখ রেখে এমন সময়ে একে-বারে হুড়মুড় ক'রে গিয়ে পড়লাম—'

'কি খানায় পড়লে নাকি ?

'তা-ও বোধ করি ভালো ছিল, পড়লাম এক আর্টিষ্টের ঘাড়ে !'

'আর্টিষ্টের ? I am dashed Bews। বিস্ফোরণ ঘটল না ?'

'ঘটলো বই কি, নইলে আর funny কেন ?'

'সেখানে গুল্মের আড়ালে নিরিবিলি ব'সে এক শিল্পী আঁকছিল ছবি ঐ কোকিলটারই। শিল্পী খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, দিলে তো আমার পাখীটা উড়িয়ে, অভদ্র কোথাকার !'

'অভদ্র বল্‌ল ? আর তুমি ঘুঁষি মারলে না ?'

'তুমি হ'লেও মারতে না।'

'মারতাম না ! একে শিল্পী তায় গালাগালি দিল।'

'আরে শিল্পী যে স্ত্রীলোক।'

'একে শিল্পী তাতে আবার স্ত্রীলোক, এ যে অষ্ট্রেলিয়ার বুশম্যানদের বিষ-মাখানো শরের ফলা। যাক্, তোমার কি রকম লাগলো?'

'সত্যি কথা বলতে কি আমার খারাপ লাগলো না, বরঞ্চ বড় মনোরম লাগলো।'

'তখন কি করলে?'

'হাজার বার মাপ চাইলাম। মহিলাটি বল্ল, কিন্তু তোমার মনোভাব তো কোকিলে বুঝতে পারবে না। আমার ছবিটা যে শেষ হলো না। দেখো দেখি লেজের কাছে খানিকটা আঁকা হয় নি। বল্লাম, মনে করো না কেন, পাখীটার লেজ ছিল না। আমার কথা শুনে মেয়েটি হেসে উঠল। সে কি হাসি। হঠাৎ যেন বাতাসে এক-রাশ জুঁই ফুল ঝরে পড়লো।'

'বলো কি। মেয়েটি তবে সুন্দরী!'

'সুন্দরী বলে সুন্দরী। আবার বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের সাহায্য নিতে হ'ল—

She was a phantom of delight,
When first she gleamed upon my sight.'

প্যালিসার বাকি পদটুকু পূরণ করিল, বলিল—

'A lovely apparition, sent
To be a moment's ornament!'

'ওখানে একটু ভুল হ'ল, সে আর moment's ornament নয়!'

'কেমন?'

'মহিলাটির বর্ত্তমান নাম Mrs Robert Bews!'

বিস্মিত প্যালিসার উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—'You lucky dog! who thcught as much!'

তারপর ঠাট্টা করিয়া বলিল—'দেখলে তো শিল্পীরা মারাত্মক লোক কিনা! পাখী উড়িয়ে দেবার অপরাধে এখন আস্ত শিল্পীটাকে ঘাড়ে

ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ তো! তারপরে একটু থামিয়া বলিল—শিল্পীর স্বামী হিসাবে তুমিও কম মারাত্মক নও।'

'এবারে বুঝলে কোকিলের স্মৃতি কেন আমার কাছে funny!'

বিউস ও প্যালিসার কেহই রীতিমতো সৈনিক নয়। বিউস এঞ্জিনিয়ার। বিবাহের পরে সস্ত্রীক সে এদেশে আসিয়াছিল নির্মীয়মান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের দপ্তরে এঞ্জিনিয়ারের চাকুরি লইয়া। আগ্রা সহরে সে বাসের জন্য একটি সরকারী বাংলো পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল নিজে আগ্রায় থাকিতে পারিত না। এলাহাবাদ ও কানপুরের মধ্যে তখন রেল শড়ক তৈয়ারী হইতেছিল। তদারকের জন্য সে এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিল। তাদের ফিরিতে বিলম্ব হইবে জানিয়া মিসেস বিউস কানপুরে এক বান্ধবীর কাছে বেড়াইতে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটিয়া আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। জেনারেল হ্যাভেলকের সৈন্যদল এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিলে বিউস সৈন্যদলে এঞ্জিনিয়ার রূপে ভর্ত্তি হয়। এলাহাবাদ ও কানপুরের মধ্যে ছোটখাটো এক সংঘর্ষে সে কিঞ্চিৎ আহত হয়, কিন্তু এলাহাবাদে ফিরিয়া না গিয়া সৈন্যদলের সঙ্গেই থাকিয়া যায়, কানপুরে পৌঁছানো তাহার বড় দরকার।

প্যালিসার এলাহাবাদ সহরের সিভিল সার্ভিস দপ্তরভুক্ত চাকুরে। সে-ও ঐ একই সংঘর্ষে আহত হইয়াছিল। বিউস ও প্যালিসারের পরিচয় অল্প দিনের, সৈন্যদলে পরিচয় পাকিয়া উঠিতে বেশি সময় নেয় না। কানপুর সহর সিপাহিদের হস্তগত হইলেও ইংরেজ নরনারীগণ তখনো নিরাপদে আছে এইটুকু সংবাদ মাত্র তাহারা পাইয়াছে; জেনারেল হ্যাভেলকও তার বেশি সংবাদ জানে না। বিউস অশক্ত না হইয়া পড়িলে বোধ করি একাকী সৈন্যদলেব আগেই কানপুরে পৌঁছিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে উপায় না থাকায় সে আহতদের সঙ্গে চলিয়াছে এবং সৈন্যদলের পিছনে একটি আম্রকুঞ্জে বিশ্রাম করিতেছে।

তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। যুক্তপ্রদেশের রৌদ্রমার্জিত শস্যবর্জিত অসীম প্রান্তরের আসর মরীচিকার দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইতস্ততঃ

আম্রবনের ছায়ার মরূদ্যান। ছায়াটি যেমন স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর, রৌদ্র তেমনি প্রখর এবং অবারিত; আর দিগদিগন্তব্যাপী প্রশান্তি এমন অটল যে ঐ কুহুস্বরের নিরন্তর গুণ টানাতেও তাহা যেন একপা-ও নড়িতেছে না। এমন অখণ্ড শান্তিময় পরিবেশের কোথাও যে দুইদল মানুষে সংঘর্ষ চলিতেছে ভাবিতেও কেমন বিস্ময় বোধ হয়, মনে হয় সেটা যেন পৃথিবীর দিবানিদ্রার দুঃস্বপ্ন।

তখন অপরাহ্ণ, রোদ পড়িয়া আসিয়া বাতাসের তাপ কমিয়াছে। বিউস ও প্যালিসার শয্যাত্যাগ করিয়া আম্রবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিউস বলিল—'হিন্দুস্থানের কোকিলের ধৈর্য্য অসীম।'

প্যালিসার বলিল, 'হাঁ হিন্দুস্থানের সিপাহির মতোই—'

এখনো ডাকিতেছে।

এখনো লড়িতেছে।

ওর কুহুস্বরে জীবনের কত বড় ট্রাজিডি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ওর গুলিতে যে ট্রাজিডির সৃষ্টি।

প্যালিসার বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, 'কি আশ্চর্য্য, এখানে একখানা বই এল কি করে!'

এক গাদা ভাঙা বোতল গেলাস দড়িদড়া হাঁড়িকুড়ির মধ্যে মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানা বই।

প্যালিসার বইখানা কুড়াইয়া লইতেছে সেই অবকাশে বিউস বলিল—, 'লুটের মাল বোধ হচ্ছে, দু' একদিন আগে সিপাহিরা এখানে আশ্রয় নিয়ে থাকবে।'

বই নয়, একটি সুদৃশ্য লেদার কেস্।

প্যালিসার লেদার কেস্‌টি খুলিয়া বলিয়া উঠিল—'A phantom of delight!'

কোথায় যে কি পাওয়া যায়! এ প্রায় তোমার কোকিলসন্ধানে গিয়ে শিল্পীর সাক্ষাৎ লাভের মতো!'

কাছে আসিতে আসিতে বিউস বলিল—'এমন কি রত্ন পেলে।'

'একখানি ছবি—তরুণীর এবং সুন্দরীর!'

'ল্যাকিম্যান! দেখি, দেখি'—এই বলিয়া লেদার কেসটি হাতে লইয়াই বিউস চমকিয়া উঠিল, বলিল—'মিসেস বিউস!'

'মিসেস বিউস!'

'আমার স্ত্রী!'

প্যালিসার বলিল—'এখানে এলো কি ক'রে?'

বিউস কেসটির খোলা খাপ হাতড়াইয়া দেখিল আর কিছু নাই, না একটা টুকিটাকি, না একছত্র লেখা।

'তোমার স্ত্রীর লেদার কেস?'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আমি চিনি।'

প্যালিসার বলিল—'তবে কি লুটের মাল?'

বিউস বলিল—'খুনের মাল নয় তার নিশ্চয়তা কি?'

'না, না, তা হ'তেই পারে না। কানপুর সহরের ইংরেজ নরনারী এখনও নিরাপদে আছে।'

প্যালিসারের কথা বিউসের কানে গেল কিনা জানি না, ছবিখানার দিকে তাকাইয়া মূঢ়ের মতো সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখনো কোকিলটা ডাকিয়া চলিয়াছে, কু-উ, কু-উ, কু-উ, কু-উ।

জেনারেল হ্যাভেলকের সৈন্যদল কানপুর পুনরধিকার করিয়াছে। কানপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ শেরার আবার কানপুরের ভার লইয়াছে। সে কয়েকজন গোরা সৈন্য সঙ্গে লইয়া কানপুর শহর পরিদর্শন করিতেছে। সে যখন চকে পৌছিল, দেখিল যে, কোথা হইতে এক ঢুলি আবির্ভূত হইয়া সশব্দে ঢোল বাজাইয়া দিয়া হাঁকিল—

খাল্‌ক-ই-খুদা
মুল্‌ক-ই-কোম্পানী বহাদুর
হুকুম্‌-ই-সাহেবান আলিশান।

অর্থাৎ কিনা কোম্পানীর রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল, এখন হইতে বড় সাহেবের হুকুম মানিতে হইবে।

ঢুলীর অযাচিত সহযোগিতা দেখিয়া মিঃ শেরার ভাবিল যে, লোকটা হয়তো ঠিক এমনিভাবেই নানার রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, জল্লাদের মত নকিবও নিরপেক্ষ, যে-পক্ষের জয় নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

মিঃ শেরার কোটওয়ালীর কাছে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিল। কোটওয়ালীর উত্তরদিকে একটি বড় বাড়ী, লোক আছে মনে হয় না, বাড়ীটি সরকারী কাজের জন্য অধিকার করা যায় কিনা দেখিবার জন্য উহার সম্মুখে গিয়াছে অমনি এক কাণ্ড ঘটিল। মুহূর্ত মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে পাঁচ, সাত, দশজন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল—

ইওর অনার সেভ আস্—
হামলোগ লয়াল হ্যায়—
শালা লোগ হামলোগকো একদম মার ডালা—
ওয়ান মান্থ ইন্ দিস হাউস—
নো ফুড্, নো স্লিপ—

প্রেয়িং ফর ইয়োর রিটার্ণ—

এণ্ড দেয়ার ডিফিট—

সেভ আস্—

ভেরি লয়াল—

লোকগুলির ভাব, ভাষা, চেহারা ও অবস্থা দর্শনে শেরার হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না, অবশেষে মনে মনে হাসিয়া মুখে গম্ভীর ভাব আনিয়া শুধাইল, তোমরা কে ?

উই বেঙ্গলিস্—

ভেরি লয়াল্—

কোম্পানীকা নোকর—

আবার এক সঙ্গে দুঃখের কোরাস আরম্ভ হয় দেখিয়া দলের একজন প্রবীণকে বাছিয়া লইয়া সে শুধায়, তুম কোন্ হ্যায় ?

লোকটি বলে, ইওর অনার হাম বদ্যিনাথ মুখার্জি কোম্পানীকা নোকর ফর থ্রি জেনারেশন্স। মাই গ্র্যাণ্ডফাদার কোম্পানীকা নোকর।

শেরার বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলে, হ্যাং ইওর গ্র্যাণ্ডফাদার।

মুখুজ্জে বলে, হি ইজ্‌ লং ডেড, স্যার।

দেন হ্যাং ইওর ফাদার।

হি অল্‌সো ডেড স্যার।

দেন গো হ্যাং ইওরসেলফ্।

কোম্পানীর বিচারবিভ্রাটে সন্ত্রস্ত মুখুজ্জে সাহেবের পায়ের বুট জুতার উপরে পড়িয়া বলে, হামতো ইওর বুটশিপকা লয়াল সার্ভেণ্ট হ্যায়।

দেন টেল মি হোয়াট ইউ আর এণ্ড হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট।

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মুখুজ্জে নিজেদের অবস্থা ও প্রার্থনা বিবৃত করে, তাহার সঙ্গীরা নীরব সমর্থনে মুখুজ্জের বাগ্মিতা ও সাহেবের মুখভাব লক্ষ্য করিতে থাকে।

বদ্যিনাথ মুখুজ্জে যাহা বলিল, তাহা হইতে স্বেদকম্পপুলক অশ্রু

ও মূর্চ্ছা বাদ দিলে এবং হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা ও ইংরাজীর বিচিত্র মিশ্রণ ছাঁকিয়া লইলে এইরূপ দাঁড়ায়।

এই কয়জন রাজভক্ত বঙ্গসন্তান বহুদিনের প্রবাসী। সকলেই কোম্পানীর চাকুরে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে তাহারা আগ্রা, মীরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত। খোদ বদ্যিনাথ কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারী করিত। এমন সময়ে শ্যালক সিপাহীলোকেরা ক্ষেপিয়া ওঠে। এই সব বাঙ্গালী রাজভক্ত কাজেই অনেক নিগ্রহ সহিতে বাধ্য হয় এবং দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিয়া কানপুর শহরে আসিয়া আশ্রয় লয়। সিপাহীগণ তাহাদের মারিয়াই ফেলিত, কিন্তু নিতান্তই হোলি থ্রেড ও হোলি টাফট্ অব্ হেয়ারের বলে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে সত্য, কিন্তু সিপাহী পক্ষে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিবার অপরাধে তাহারা খাদ্য পায় নাই। সিপাহী শাসনে অনুমতি ছাড়া খাদ্যসংগ্রহের উপায় না থাকায় এই কটি রাজভক্ত বঙ্গসন্তানকে লংড্রন ফাষ্টিং বা একটানা একাদশী করিতে হইয়াছে। তাহাও না হয় সহ্য হয়, কারণ প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন খাইতেও পারে, তেমনি উপবাস করিতেও অভ্যস্ত। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা ইহাদের যা কিছু সঞ্চিত ছিল, যুদ্ধের ঋণ বলিয়া সিপাহীরা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা কোনমতে এখানে আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোম্পানী বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে, এখন তাহাদের উপরে যাহাতে জুলুম না হয় 'ইওর অনারকে' দয়া করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বদ্যিনাথ থামিলে অন্যান্য রাজভক্ত বঙ্গসন্তানগণ সমস্বরে বলিল—হি ইজ ট্রুথফুল স্যার—অর্থাৎ তাহার সব কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শেরার বুঝিল খুব সম্ভব ইহাদের বিবরণ সত্য। প্রথম প্রমাণ ইহাদের ভাবগতিক ও অবস্থা। দ্বিতীয় প্রমাণ, কলিকাতা হইতে আগত ইংরাজ সৈনিকদের কাছে সে শুনিয়াছিল যে, তথাকার শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ সিপাহীদের আচরণ সমর্থন করে না, তাহাদের অনেকে নাকি

সিপাহীদের কাজের নিন্দা করিয়া বহুতর গদ্য পদ্য রচনা লিখিয়া ফেলিয়াছে। শেরার ভাবিল মাতৃভূমি হইতে ছিন্ন হইলেও ইহারা সেই বৃক্ষেরই তো শাখা, কাজেই লয়াল হওয়াই স্বাভাবিক। তবু একবার দস্তুরের খাতিরে বলিল, তোমরা যে রাজভক্ত তাহার আর কি প্রমাণ আছে ?

আর কি প্রমাণ হইতে পারে ? ঘোষাল বলিল, টেন ডেজ ফাষ্টিং নট প্রুফ এনাফ ?

বাঁড়ুয্যে বলিল—গড অলমাইটি নোজ।

গড অলমাইটি এবং টেন ডেজ ফাষ্টিং-এর উপরে সাহেবের খুব বেশী আস্থা না থাকায় তাহার মুখে করুণার সঞ্চার হইল না, তখন মুখুজ্জে বলিয়া উঠিল—ষ্টাণ্ড স্যার, ষ্ট্যাণ্ড—অর্থাৎ আপনি একটু দাঁড়ান এই বলিয়া সে বেগে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানি কাগজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেখানা সাহেবের হাতে দিল—সী ইওর অনার প্রুফ অব্ আওয়ার লয়ালটি।

কৌতূহলী সাহেব পড়িতে লাগিল। মুখুজ্জের সঙ্গীগণ কেহই মুখুজ্জের আচরণে কৌতূহল প্রকাশ করিল না, কারণ কাগজখানার সহিত তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সিপাহী বিদ্রোহের দুস্তর সাগরে এই উড়ুপখানা অবলম্বন করিয়াই তাহারা দুর্দ্দিনের ভরসায় ছিল। কৌতূহল অনুভব না করিলেও বদ্যিনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে পড়িল বদ্যিনাথের আশ্বাস, বদ্যিনাথ থাকিতে কোম্পানীর হাতে তোমাদের ভয় নাই। এবারে তাহার পরীক্ষার ক্ষণ সমুপস্থিত।

দরখাস্তখানার প্রথম দুটি ছত্র পড়িয়াই শেরার স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় আর তাহার মনে ছিল না। শেরার মনে মনে পড়িল—It is well known, your exellency's lordship that we, the Bengalees, are a cowardly people. *

---

* দোহাই পাঠক এ উক্তি আমার কল্পনা নয়, লেখকের কল্পনার পিতারও সাধ্য নাই এমন উক্তির সৃষ্টি করে। এই উক্তিটি History of Indian

তবু সে একাধিকবার দলিলখানা পড়িল এবং দরখাস্তকারীদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইবার মানসে প্রশ্ন আরম্ভ করিল—তোমরা শিখ-যুদ্ধে গিয়েছিলে ?

মুখুজ্জে উত্তর দিতে থাকিল—এরা সবাই নয়, আমি আর বাঁড়ুজ্জে মশাই গিয়েছিলাম।

যুদ্ধেই যদি গিয়েছিলে তবে হঠাৎ ভয় পেলে কেন ?

হুজুর যুদ্ধে যাচ্ছি বলেই সত্য সত্যই যে লড়াই করতে হবে এমন কথা বাপের কোন্ সুপুত্র ভেবেছিল ?

তোমরা কি ফৌজি ছিলে না ?

রাম ! রাম ! ওসব তো পূরবিয়ারা করবে। আমরা ছিলাম কমিসারিয়েটে। আমরা বাঙ্গালীরা ঐ কাজটা ভাল পারি। * হুজুর আমার গ্র্যাণ্ড ফাদার তেসরা মারাঠা যুদ্ধে ঐ কাজ করেছেন, আমার ফাদার বরাবর ঐ কাজে ছিলেন, বংশধারার দাবীতে আমিও ঐ বিভাগে কাজ পেয়েছিলাম।

তোমার এতো পৈত্রিক পেশা, হঠাৎ ভয় পেলে কেন ?

পৈত্রিক পেশা সত্য, হুজুর আমার ছেলেটিও লায়েক হয়ে উঠেছে, কিন্তু কাউকে কখনও হুকুম দেওয়া হয় নি যে, কামানের পাল্লায় এগিয়ে যেতে হবে।

যুদ্ধের সময়ে কখনো কখনো তেমন প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রয়োজন হয় বলেই কি আমাদের স্বভাব বদলাবে ? হুজুর আমরা বাঙালীরা হচ্ছি Children taming people অর্থাৎ ছাপোষা মানুষ।

কামানের পাল্লায় যাবার হুকুম শুনে কি করলে ?

Mutiny, Volume I (By Charles Ball) নামক গ্রন্থে ৬১২ ... পাইয়াছি। বিশ্বাস না হইলে, বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি নিজেদের সম্বন্ধে এমন সরল সত্য লিপিবদ্ধ করিতে সাহস পায় নাই, আপনি উক্তিটি যথাস্থানে পাইবেন।

* পাঠক ইহাও আমার অনুমান নয়। বাংলা উপন্যাসের অনেক নায়কই

আর কি করবো? আমরা বাঙালীরা যা পারি তাই করলাম, জঙ্গীলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের বরাবর এই দরখাস্তখানা লিখে তাঁর সেক্রেটারীর হাতে দিলাম।

তিনি কি করলেন?

তখনি দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রে বললেন, বাস্তবিক তোমরা মারা পড়লে কমিসারিয়েটের কাজ চালাবে কে?

তারপরে?

তারপরে আর কি, শিখ লড়াই ফতে করে কোম্পানীর ফৌজ সাট্‌লেজ পার হ'ল, আমরা পিছু পিছু চল্‌লাম।

দরখাস্তখানা তো থাকলো মিলিটারী দপ্তরে, তার নকল নিলে কেন?

পাছে কখনো কাজে লেগে যায় এই আশায়। সত্যিই তো আজ কাজে লেগে গেল হুজুর! এখানা দেখে তবে তো হুজুরের বিশ্বাস হ'ল যে আমরা রাজভক্ত।

তোমরা অবশ্য তখন রাজভক্ত ছিলে, কিন্তু এখনো যে আছ তার প্রমাণ?

এবারে মুখুজ্জে যে কয়টি কথা বলিল, তাহা স্বর্ণাক্ষরে বাঁধাইয়া রাখিবার মতো। সে বলিল—হুজুর ভীরু লোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।

শেরার বুঝিল তাহার এখনো অনেক দেখিবার, অনেক শুনিবার এবং অনেক শিখিবার বাকি আছে। সে বলিল—আচ্ছা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো গিয়ে, কেউ তোমাদের উপরে অত্যাচার করবে না।

মুখুজ্জে বলিল—নো মাউথ ওয়ার্ড স্যার অর্থাৎ শুধু মুখের কথায় হবে না, অমনি এক ছত্র লিখে দিতে হবে।

কমিসারিয়েটে কাজ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছে। আপাততঃ ইন্দিরা উপন্যাসের ইন্দিরার স্বামী এবং গোরা উপন্যাসের কৃষ্ণদয়াল বাবুর কথা মনে পড়িতেছে। খুঁজিলে আরো অনেক সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এখন কাগজ কলম পাই কোথায় ?

এই আনছি বলিয়া মুখুজ্জে মুহূর্ত মধ্যে কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ফেলিল—

This house belongs to one Mokarjea, very loyal subject. Please not to molest.*

তারপরে শেরারের হাতের কাছে কাগজ ও কলম ধরিয়া বিনীত হাস্যে বলিল—স্যার একটা সই

সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিতেই মুখুজ্জে সেখানা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বাড়ীর দরজার কাছে সযত্নে সাঁটিয়া দিল—আর সব কটি বঙ্গ-সন্তান সাহেবকে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া ধন্যবাদ জানাইল।

শেরার অন্যত্র রওনা হইল আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল আশ্চর্য এই বাঙালী জাতটা! জাদুকরের মতো কোথা হইতে কাগজ-কলম বাহির করিল। আর সাহেবের স্বাক্ষরের উপরে ইহাদের কি অসীম বিশ্বাস! হইবেই বা না কেন, ঐ দেশেই তো কোম্পানীর রাজ্যের প্রথম বুনিয়াদ! দীর্ঘকালের শাসনে ইহাদের মজ্জা অবধি বেশ নরম হইয়া আসিয়াছে, তুলনায় এই পূরবিয়া গোঁয়ারগুলো কি বর্বর। শেরার মনে মনে স্থির করিল বিদ্রোহের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই উপরে ধরাও করিয়া কলিকাতায় বদলি হইতে হইবে—বাঙালীর কাছে শিখিবার অনেক কিছু আছে।

ওদিকে সাহেব নিরাপদজনক দূরে চলিয়া যাইতেই মুখুজ্জে অপস্রিয়মান সাহেবের প্রতি দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সমবয়সী বাঁড়ুজ্জেকে বলিল—দেখ্‌লে ভায়া কেমন পলিটিক্স করলাম।

একজন বলিল—অত নীচু না হলেই পারতেন।

মুখুজ্জে বলিল—আরে নীচু না হলে জুতো চুরি করা যায়? তাছাড়া নীচুটাই বা কি হলাম? দরখাস্তখানা তো মিথ্যা নয়। তার উপরে

* এটিও বাস্তব সত্য, কল্পনা নয়। দ্রষ্টব্য Havelock's March on Cawnpore by J. W. Sherar.

দুটো মিষ্টি কথা বলেছি এই তো! তা রাজার জাতকে অমন বলতে হয়।

দেখা গেল যে, মুখুজ্জের সঙ্গে কাহারো মতের বিশেষ তারতম্য নাই।

অতঃপর বলিল—চলো আজ ভালো করে খাওয়া দাওয়া যাক। এ ক'দিন নাকে ভাত দিয়েছি না মুখে ভাত দিয়েছি ঠিক ছিল না। আজ নিশ্চিন্তি। বাবা—এ স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের সই। গোরা কালা সবাই বাড়ীর কাছ থেকে হেঁটমুণ্ডে ফিরে যাবে। নাও চলো, আর কোন ভয় নেই।

তখন সকলে মুখুজ্জের অনুসরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

২

বদ্যিনাথ মুখুজ্জের আশঙ্কা মিথ্যা নয়, এ সব বিষয়ে রাজভক্ত প্রজার অনুমান বড় মিথ্যা হয় না। কানপুর সহর পুনরায় দখল করিবার পরে কোম্পানীর ফৌজ অত্যাচার আরম্ভ করিল। বিচার করিয়া করিলে যাহা ন্যায়ধর্মরক্ষা, নির্বিচারে করিলে তাহাই অত্যাচার। বিবিঘরের হত্যা-কাণ্ডের অপরাধে ইংরাজ যাহাকে পারিল ফাঁসি দিল, সামান্যতম সন্দেহের ছায়াগ্রস্ত ব্যক্তিও মুক্তি পাইল না। অত্যাচারের আশঙ্কায় লোকের মনে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আত্মরক্ষার আশায় অনেকেই নির্দোষ প্রতিবেশীকে ধরাইয়া দিল; প্রতিবেশী মরিল, নিজেও রক্ষা পাইল না। একতরফা দণ্ডের আঘাতে সমগ্র কানপুর সহর মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ফল কথা সিপাহীরা যে কাণ্ড করিয়াছিল কোম্পানীও তাহার পুনরভিনয় করিল, তবে সেবারে ইংরাজ মরিয়াছিল, এবারে ভারতীয় মরিল তফাৎ এইটুকু মাত্র। জেনারেল নীলের শাসনে কানপুরের নাগরিকদেহ ভয়ে নীল হইয়া গেল। অবশ্য মুখুজ্জের আবাসের উপরে কেহ হানা দিল না, তবে সেটা কোটওয়ালীর কাছে

বলিয়াই হোক বা ম্যাজিষ্ট্রেট শেরারের অনুশাসন বলিয়াই হোক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক। তবু মুখুজ্জের সতর্কতার অন্ত ছিল না। সে নিজে কখনো বাড়ী হইতে বাহির হইত না কিংবা অপর কাহাকেও বড় বাহির হইতে দিত না। তবু এক-আধবার বাহির না হইলে চলে না, বাজার করিতে হয়। সন্ত্রস্ত ইঁদুর গৃহস্বামীর অনবধানতা লক্ষ্য করিয়া যেমন চুরি করিয়া বাহির হইয়াই আবার গর্তে প্রবেশ করে তেমনি কেহ একজন কোন এক ফাঁকে গিয়া বাজার করিয়া আনিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে গোপনে থাকিয়াও সহরের বিভীষিকার প্রভাব হইতে মুখুজ্জে ও তাহার সঙ্গীগণের রক্ষা ছিল না। শ্মশান যাত্রীর উৎকট চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গৃহস্থ যেমন জাগিয়া উঠিয়া ভীতি বোধ করে, তেমনি আসামীর অন্তিম আর্ত মিনতিতে মুখুজ্জেদের মুহুর্মুহু চকিত করিয়া দিত।

দোহাই কালেকটার সাহেব আমার কোন কসুর নাই।
দোহাই কোম্পানী বাহাদুর আমি নির্দোষ।
গোড় লাগে কাপ্তান সাহেব তুমি আমার বাপ।
আসামীদের কোটওয়ালীতে টানিয়া আনা হইতেছে।

মুখুজ্জে জানলা দিয়া উঁকি মারিয়া সদর রাস্তায় ভূপাতিত দেহটি একবার দেখিয়াই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিত আর কাঁপিতে কাঁপিতে উপবীত অবলম্বন করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপিতে থাকিত। কিন্তু মন লাগিত না, তাহার দৃষ্টি শিখযুদ্ধের দরখাস্তখানার উপরে পড়িত, মুখুজ্জে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইত। দরখাস্তখানা ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে গোরা লোক ঘরে ঢুকিবামাত্র দেখিতে পায়। মুখুজ্জে অনেক ঠেকিয়া বুঝিয়াছিল যে, সময়বিশেষে ভগবানের চেয়ে শেরার সাহেব প্রবলতর।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সপারিষদ মুখুজ্জে দ্বার দিয়া বসিয়াছিল। মাঝখানে মুখুজ্জে আর চারদিকে বাঁড়ুজ্জে, ঘোষাল, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি রাজভক্ত বঙ্গ-সন্তানগণ। একটা পাটের দড়িকে অতিরিক্ত কয়েকটা পাক দিয়া সূক্ষ্মতর করিয়া একপ্রান্তে একটি গেরো বাঁধিয়া

দিলে যেমন দেখিতে হয় মুখুজ্জের দেহটি ঠিক তেমনি, সমস্ত দেহটা শুকাইয়া পাক খাইয়া রসকষহীন একটি রজ্জুতে পরিণত হইয়াছে, ঐ গেরোটি তাহার মস্তক, ঠাহর করিয়া দেখিলে মুখমণ্ডলে নাক চোখ মুখের কয়েকটি গর্ত দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। মুখুজ্জের জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষা প্রবঞ্চনার ইতিহাস সম্যক জানিলে হয়তো তাহার প্রতি ধিক্কারের ভাব মনে উদিত না হইয়া সহানুভূতির ভাবটাই জাগ্রত হইবে, কিন্তু তেমন অবসর কোথায় ? মানুষকে দোষমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ বিচার করিতে বসে না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া যখন স্থির হইয়া গিয়াছে তখনি বিচার প্রহসন আরম্ভ হয়। মুখুজ্জে ঠকিতে ঠকিতে শিখিয়াছে যে, ঠকানোটাই জীবনের উদ্দেশ্য, দুঃখ পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে, দুঃখটাই জীবনের ধর্ম, ভয় পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে, ভীতিবোধ না থাকিলে কার্যোদ্ধার হয় না ; আর রাজ-ভক্তি ! বাল্যকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রতি ভক্তি—এসমস্তই তো রাজভক্তির ভূমিকা, রাজভক্তি সমস্ত ভক্তির ঘনীভূত চরম মূর্তি। মুখুজ্জেকে আমি বিচার করিতেছি না, অঙ্কন করিতেছি মাত্র।

যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিন সন্ধ্যায় মুখুজ্জের বাড়ীর সদর দরজায় ঘা পড়িল এবং সেই শব্দে বঙ্গসন্তান কয়টির চিত্ত উদ্বেগে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, অসময়ে দরজায় ঘা দেয় কে ? বাঁড়ুজ্জে আফিংয়ের ঘোরে ঝিমাইতেছিল, চটকা ভাঙিয়া বলিযা উঠিল, দরজা এঁটে দাও, বলিয়াই আবার নেশার স্রোতে ডুব দিল।

গুম্ গুম্ গুম্ !

গুম্ গুম্ গুম্ !

মুখুজ্জে রাজভক্ত হইলেও নির্বোধ নয়। তাহার আশঙ্কা হইল যদি সরকারি লোক হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা করা কিছু নয়, আর উপেক্ষা করিলেও তাহাকে এড়ানো যাইবে না, দরজা ভাঙিয়া ঢুকিবে। তাই মুখুজ্জে একজনকে বলিল—দেখে এসো কে ?

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া একজন ফিরিয়া আসিল, বলিল—ইনিই দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন।

সকলে দেখিল একজন বাঙালী যুবক, বয়স পঁচিশের বেশী হইবে না, ছিন্ন মলিন বেশ, উদ্বাস্তু চেহারা।

মুখুজ্জে শুধাইল, তুমি কে বট?

যুবক বলিল—মহাশয়, আমি একজন বাঙালী যুবক।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কোত্থেকে আসছ, কি সমাচার, কি পরিচয় জানা আবশ্যক।

মশায় আমার নিবাস কাশীধামে। আমি কাজের সন্ধানে এলাহাবাদে আসি, সেখানে কোন কাজের সন্ধান না পাওয়ায় কানপুরের উদ্দেশে রওনা হই। পথে সিপাহীদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে কোন মতে এখানে এসে পৌঁছেছি।

এ বাড়ীর সন্ধান পেলে কিভাবে?

সহরের একজনের কাছে শুনলাম এ বাড়ীতে কয়েকজন বাঙালী আছেন।

তোমার নাম কি বাপু?

আজ্ঞে শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

তোমরা?

আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

এ পরিচয় যথেষ্ট নয়।

আর কি পরিচয় দেবো বলুন।

তুমি যে সিপাহীদের গুপ্তচর নও তার কি প্রমাণ?

তাদের দ্বারাই যে আমি সর্বস্বান্ত।

তোমার কথা ছাড়া তার তো কোন প্রমাণ নেই।

আজ্ঞে আমার কথা বিশ্বাস করুন।

এই সময়ে বাঁড়ুজ্জে হঠাৎ আবার চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল—"অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ"—তারপরে সে আবার পূর্ববৎ নীরব হইল।

সকলের মৌনভাবে বোঝা গেল যে বিপদের সময়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না।

তাহাদের ভাবগতিক দর্শনে উদ্বিগ্ন যুবকটি বলিল—আজ্ঞে বাঙালী হয়ে বাঙালীকে রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে?

ঘোষ বলিল—ওসব অনেক শুনেছি এখন কেটে পড়ো।

যুবকটি ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মুখুজ্জে বলিল—আচ্ছা, তুমি ব'সো।

সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া বলিল—এতরাত্রে আর কোথায় যাবে?

যুবকটি থাকিয়া গেল।

সেদিন শেষ রাত্রে আর্ত বামাকণ্ঠস্বরে হঠাৎ সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই এরূপ আর্তস্বরে অভ্যস্ত, তবে নারী কণ্ঠস্বরটা নূতন বটে। অনুরূপ অবস্থায় কি কর্তব্য সকলেরই পরিজ্ঞাত, সকলে উঠিয়া দরজা জানলার অর্গল পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়া বসিল।

কেবল সেই বাঙালী যুবকটি বলিল—আপনারা চুপ ক'রে বসলেন যে! একবার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক ব্যাপারটা কি?

কিন্তু সকলের মুখের ভাব দর্শনে তাহার মনে হইল এমন অদ্ভুত কথা যেন তাহারা ইতি শোনে নাই।

একজন বলিল—তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? অপরে বলিল—চুপ ক'রে ব'সে থাক তো।

তারক বলিল—আমি বরঞ্চ একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

বাঁড়ুজ্জের নেশা তখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, শ্লেষ্মাবিজড়িতকণ্ঠে বলিল—অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নর কর্তুমিচ্ছতি, স ভূমৌ··· বাকিটুকু আর শ্রুতিগোচর হইল না।

তাহারা কিছুই করিবে না বুঝিতে পারিয়া আর্ত বামাকণ্ঠের রহস্যোদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে তারক জানালার দিকে অগ্রসর হইতেই সকলে তাহার উপরে গিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

কে একজন বলিল, সিপাহীর গুপ্তচর না হয়ে যায় না!

মুখুজ্জে বলিল—বাবা, তোমাকে আশ্রয় দিয়ে কি অপরাধ করেছি ? তবে ? তবে এমন ক'রে ছাপোষা মানুষগুলোকে মেরে কি লাভ ?

আপনাদের দেখছি প্রাণের ভয় বড্ড বেশি।

এত দুঃখের মধ্যেও তাহার কথায় সকলের হাসি পাইল ; মুখুজ্জে বলিল—ভয়টা তবে কিসের জন্য হবে ?

কে কার উপরে অত্যাচার করছে দেখতে হবে না ?

চারদিকে অত্যাচারের বন্যা বইছে। কে কার উপরে নয় ! যে যার উপরে পারছে করছে। নিবারণ করতে গেলে তার কোন লাভ হবে না, মাঝে থেকে তুমি প্রাণে মারা পড়বে।

কিন্তু এমন অসহায়ভাবে থাকাও যে কঠিন।

সে কি আমরা জানি নে। দয়ামায়া আমাদেরও আছে। তবে কি জানো দুর্বলের দয়া করবার অধিকার নেই। অন্যায় সহ্য করতে হয় বলেই তো দুর্বল দুর্বল।

মুখুজ্জের সারগর্ভ উপদেশে তারকের যে চৈতন্যোদয় হইল মনে হয় না, কিন্তু সে এক্ষণে নিতান্তই অশক্ত, কেননা ইতিমধ্যে কয়েকজনে মিলিয়া তাহাকে একখানা বিছানার চাদর দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। সে অসহায়ভাবে পড়িয়া পড়িয়া গজরাইতে লাগিল।

আর্তস্বর থামিয়া গিয়াছে। তখনো রাত্রি ছিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল মুখুজ্জে চোখ বুজিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল আজ-কালকার ছেলেরা ক্রমেই বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে, না মানে গুরুজনের উপদেশ, না জানে আত্মরক্ষার উপায়। তারপরে এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাইল যে একটু বয়স ভারী দিলেই ছোকরার বীরত্বের অভিনয় চুকিয়া যাইবে, তখন সত্যই সে জীবনের রস পাইবে যেমন নিজেরা আজ পাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সে নিজে একদিন পরমা-রাধ্য পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করিয়া একটা বুনো মহিষকে তাড়া করিয়াছিল, আর একটু হইলেই মারা পড়িত আর কি ! বহুদিন পূর্বে-কার অবিমৃষ্যকারিতায় নিজের প্রতি সে ধিক্কারের ভাব অনুভব করিল—আর সেইসূত্রে মনস্তত্ত্বের কোন্ নিয়মে না জানি যুবকটির প্রতি তাহার

মনে এক প্রকার সস্নেহ অনুকম্পার ভাব উদিত হইল। মুখুজ্জে উঠিয়া গিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া দিল।

পরদিন সকালে যুবকটিকে চোখে চোখে রাখিল, তাড়াইতেও সাহস হয় না, আবার আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠা।

দেয়ালে বিলম্বিত সেই দরখাস্তখানা দেখিয়া তারক শুধাইল—ওটা কি?

কাল রাত্রে কাগজখানা সে দেখিতে পায় নাই।

মুখুজ্জে বলিল—প'ড়ে দেখো, ঐ কাগজখানার জোরেই এখনো টিকে আছি।

কাগজখানা পড়িয়া যুবক ক্রোধে বলিয়া উঠিল—এমন কথা আপনারা লিখতে পারলেন?

মুখুজ্জে বলিল—কেন বাপু মিথ্যে কি লিখেছি?

মিথ্যা নয়?

তুমিই ভেবে দেখোনা কেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হলে বাঙালীর গুরু-পুরুত শালগ্রাম শিলা দর্শন চাই, মন্ত্রপাঠ চাই, নির্মাল্য ধারণ চাই! চাই কি না বল? ঐগুলোকেই গুছিয়ে এক কথায় যদি ভীরুতা বলা হয় তবে দোষ কিসের?

অপরে বলে বলুক, তাই বলে নিজ মুখে স্বীকার?

আমাদের বাপু মনে মুখে আড় নেই। তাছাড়া কামানের মুখ একবার ছাড়া দুবার কথা বলে না।

তেলেঙ্গি লড়ছে, পূরবিয়া লড়ছে, শিখ লড়ছে, মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয়।

আরে বাপু আমরা যে বাঙালী! তেলেজলে আমরা মানুষ। মাছের ঝোল-ভাত আমাদের প্রাণ, মা-মাসির কোলে আমাদের স্থান। ওসব চোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা করো কেন?

জগতে আর কারো মাসি পিসি নেই—আর মাছ ভাতও কেউ খায় না! আমরাই কি সব চেয়ে অকর্মণ্য!

অকর্মণ্য এমন বলি না। কাজ আমরাও জানি। হিসাব রাখতে

দাও, খাতা লিখতে দাও, সাহেবের মুন্সীগিরি করতে দাও। করুক তো দেখি এসব কাজ ওরা! জিভ বেরিয়ে পড়বে।

বলিয়া কিভাবে কত খানি জিহ্বা বহির্গত হইবে মুখুজ্জে তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইল।

বাঁড়ুয্যের নেশা এখন সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়াতে মাতৃভাষার উপরে পুনরধিকার স্থাপিত হইয়াছে, সে বলিল—ভালো রে ভালো, ছোকরা যে আবার তর্ক করে।

ব্যাপারটা তখন ঐ খানেই মিটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কোটওয়ালীতে মুখুজ্জের ডাক পড়িল। সে নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে পৌঁছিয়া দেখে স্বয়ং শেরার সাহেব উপস্থিত।

হ্যালো মুখার্জি তোমাদের বাড়ীতে কি একজন বাঙালী ছোকরা আশ্রয় নিয়েছে?

না, হুজুর।

আমিও তাই বলি। আমাদের গোয়েন্দা বলেছিল তাকে নাকি ঐ দিকে যেতে দেখেছে, লোকটা সিপাহীপক্ষের লোক।

না হুজুর, এমন লোককে আমি কেন আশ্রয় দিতে যাব!

রাইট! আমি গোয়েন্দাকে তখনি বলেছিলাম এ কখনো সম্ভব নয়। মুখার্জি রাজভক্ত প্রজা, এরকম কাজ সে কখনো করবে না।

হুজুর ঠিক বুঝেছেন।

আচ্ছা তুমি যাও।

মুখুজ্জে লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া আসিল।

অন্যস্থান হইলে শেরার খানাতল্লাসী করিত, কিন্তু মুখুজ্জের বাড়ী সম্বন্ধে প্রয়োজন অনুভব করে নাই, কারণ মুখুজ্জের মুখ-নিঃসৃত সেই অক্ষয় বাণী অন্ধ বাদুড়ের মতো এখনো তাহার অন্ধকার মনের মধ্যে পাক খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে ছিল—ভীরুতাই রাজভক্তির বীজ! মুখুজ্জের মতো ভীরু লোক কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান

করিবে ইহা শেরারের কল্পনাতীত। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আশ্রিতবাৎসল্য প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

মুখুজ্জে ফিরিয়া আসিয়া আসল ঘটনা প্রকাশ করিল না, যা হয় কিছু একটা বলিয়া দিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কর্তব্য কি? উক্ত যুবকই যে শেরার সাহেবের উদ্দিষ্ট লোক সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। শেষে ভাবিল রাতে আর গোলমাল করিয়া কাজ নাই, কাল ভোরবেলায় ভালোয় ভালোয় উহাকে বিদায় দিলেই চলিবে।

পরদিন ভোরবেলায় উঠিয়া যুবকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মুখুজ্জে মনে মনে বুঝিল যে শেরার সাহেবের তলবের কারণ অনুমান করিয়া যুবক সরিয়া পড়িয়াছে, ভাবিল ভালই হইয়াছে, অপ্রিয় কাজটা আর করিতে হইল না।

এমন সময় একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মুখুজ্জে মশাই ব্যাপার কি!

সকলে শুধাইল, কি হ'য়েছে?

আর কি হবে? দরজায় শেরার সাহেবের পরোয়ানাখানা নেই, তার বদলে এই কাগজখানা ছিল।

সকলে পড়িল কাগজখানায় লিখিত আছে—This house belongs to traitors to the country—NANA Sahib.

এ ঐ মুখপোড়ার কাণ্ড।

হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়াতে দেয়ালে বিলম্বিত দরখাস্তখানার কাছে কাছে গিয়া মুখুজ্জে একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল।

কি হ'ল কি হ'ল, বলিয়া সকলে অকুস্থলে গিয়া দেখিল কে যেন দরখাস্তখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। আর মুখুজ্জে সশব্দে মেঝেতে মাথা কুটিতেছে—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল!

বিনা নোটিসে হঠাৎ গুলাব সিং স্বগ্রাম গুজরানপুরে ফিরিয়া আসিল, সে সংবাদ পাইয়াছে আগামীকাল ১লা নভেম্বর কানপুর শহরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পঠিত হইবে, তাহাতে তিনি নাকি সিপাহী পক্ষে যাহারা যোগ দিয়াছিল তাহাদের ক্ষমা করিয়াছেন। গ্রামের লোকে গুলাব সিংকে ফিরিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, বন্ধুরা শুধাইল, এতদিন ছিলে কোথায়? গুলাব সিং বলিল, শ্বশুর বাড়ী। শত্রুরা মনে মনে বলিল, এবার শ্বশুর বাড়ী যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়াছ, দাঁড়াও আগে থানাদার মর্দান আলি সংবাদ পাক। গুলাব সিং স্বগৃহে ঢুকিয়া দেখিল অস্থাবর সমস্ত লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সে বুঝিল শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে উক্ত কাজ করিয়াছে, থাকিবার মধ্যে আছে একখানা পুরাতন চার পায়া, তাহার উপরে গুলাব সিং বসিল, আর তারপরে ধীরে সুস্থে দুই হাত দিয়া প্রচুর গুম্ফ শ্মশ্রু আয়ত্তে আনিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল। সংসারে আছে তাহার একমাত্র পুত্র অর্জ্জুন সিং, বয়স কুড়ি বাইশ, কি ভাবিয়া গুলাব সিং একাই ফিরিয়াছে, পুত্রকে আনে নাই।

গ্রামের অপর প্রান্তে থানাদার মর্দান আলির বাড়ী। গুলাব সিং-এর প্রত্যাবর্তন সংবাদ পাইয়া উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া সে বলিল—এবারে শয়তানকে দেখে নেবো, এখনি গ্রেপ্তার ক'রে আনবো।

ছোট থানাদার বলিল, তা কেমন ক'রে সম্ভব? ঘোষণাপত্রে মহারাণী যে সকলকে বে-কসুর খালাস দিয়েছেন।

মর্দান আলি বলিল—ঘোষণাপত্র তো আজও জারি হয়নি, আজ ওকে গ্রেপ্তার করতে বাধা নেই। ছোট থানাদার এখনো পুরাপুরি থানাদার না হওয়ায় আইনের অক্ষরের চেয়ে অর্থের মর্যাদা বেশি দিত, সে বলিল—শেষে আবার টাকার সাহেব না গোলমাল করেন।

টাকার সাহেব কানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট।

মর্দান আলি সংক্ষেপে টাকার সাহেবের পদমর্যাদা উড়াইয়া দিয়া বলিল—কে টাকার সাহেব। গুজরানপুরে আমিই সব।

তারপরে বলিল, টাকার সাহেব যখন পালিয়ে এলাহাবাদে চলে গিয়েছিল তখন গুজরানপুর কোম্পানির নামে শাসন ক'রছিল কে? আমি থানাদার মর্দান আলি খাঁ, বাপের নাম মজবুব আলি খাঁ, ঠাকুর্দার নাম রহমৎ খাঁ, আমরা তিন পুরুষের থানাদার। কে তোমার টাকার সাহেব?

তার পরে প্রশস্ত বুকের উপর কয়েকবার চাপড় দিয়া বলিল, আমরা পাঠান, আজ দেখে নেবো বেটা শিখ শয়তানকে।

এই বলিয়া সে কয়েকজন বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া, স্বয়ং ঢাল তলোয়ারে সজ্জিত হইয়া গুলাব সিংকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল, সঙ্গে একটা নাকড়া লইতে ভুলিল না।

২

গুলাব সিং ও মর্দান আলি দু'জনেই কানপুর জেলার অন্তর্গত গুজরানপুরের অধিবাসী। দু'জনেই অবস্থাপন্ন। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে দু'জনের মধ্যে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়াই ছিল। গুলাব সিং-এর শারীরিক শক্তি বেশি, মর্দান আলির প্রতাপ বেশী, সে থানাদার। কিন্তু হইলে কি হয় গুলাব সিং-এর হাত লাঠি, তলোয়ার, বন্দুক পিস্তলে এমনি পাকা যে থানাদারকেও ভয় করিয়া চলিতে হয়। গুলাব সিং-এর বন্ধুরা তাহাকে একটু সামলাইয়া চলিবার অনুরোধ করিলে সে বলিত, আরে রেখে দাও, থানাদার ব'লে কি তার দুটো জান। একবার আসুক না।

মর্দান আলি লম্বা চওড়া জোয়ান বটে, কিন্তু গুলাব সিং-এর কাছে কিছুই নয়। ও রকম বিরাট বপু কদাচিৎ দেখা যায়, বিধাতা তাহাকে দরাজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ভিড়ের মধ্যে কখনই তাহার কাঁধের

বেশি ভোবে না, প্রশস্ত স্কন্ধ এবং কাঁচা পাকা চুল দাড়ি সমেত মস্তক ও মুখমণ্ডল অনেক দূর হইতে দেখিতে পাইয়া লোকে ফিসফিস করিয়া বলে ঐ যে গুলাব সিং। সে নাকি পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের খাস শরীররক্ষী ছিল।

একথা শুনিলে মর্দান আলি বলিত—আরে আমার ঠাকুর্দা ছিল বাদশা আলমগীরের খাস পাইক। বলা বাহুল্য, দুটি দাবীরই ঐতিহাসিক মূল্য সমান।

এমন সময়ে উত্তর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সে দাবানল দেখিতে দেখিতে প্রথমে শহরে শহরে পরে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। শহরের ও গ্রামের অবস্থাপন্ন অনেক লোকেই একদিকে বা অন্যদিকে যোগ দিল, কেহ বা স্বেচ্ছায় কেহ বা অবস্থাগতিকে। গুজরানপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় গুলাব সিং ও মর্দান আলি ভিন্নপক্ষে যোগ দিল, তবে তাহা কোন আদর্শের খাতিরেও নয় বা অবস্থার চাপেও নয়। কেন যে তাহারা ভিন্নপক্ষে যোগ দিল তাহা পাঠকের বুঝিতে পারা উচিত। সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিকাণ্ডকে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গ্রামের দুই প্রান্তে দুইজনে নীরবে বসিয়া অপরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে কানপুর হইতে খবর আসিল যে, জেনারেল হুইলার ও সাহেব-বিবিগণ সেখানে কোণঠাসা হইয়াছে, ওদিকে তাঁতিয়া টোপি সসৈন্যে যমুনা পার হইয়া কানপুরের দিকে আসিতেছে। গুলাব সিং বুঝিল আর বিলম্ব নয়, পাছে বিজয়ী পক্ষে মর্দান আলি যোগ দিয়া তাহার সুযোগ নষ্ট করিয়া দেয়। সে সিপাহীদের পক্ষে যোগ দিল।

মর্দান আলি বুঝিল সিপাহী পক্ষে যোগ দিলেই সর্বপ্রকার লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু না, যে পক্ষে গুলাব সিং তাহার বিপরীতদিকে যোগ দিয়া সহস্রবার মৃত্যুও যে শ্রেয়ঃ। সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহাদের তিনপুরুষ কোম্পানীর নিমক খাইয়া মানুষ, কোম্পানীর পক্ষ সে ছাড়িতে পারে না। গুলাব সিং সদলবলে তাহাকে তাড়া করিল,

মর্দান আলি পলাইল। গুলাব সিং তাহার বাড়ী ঘর লুটিয়া লইয়া গেল এবং গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বুকে চাপড় মারিতে মারিতে পলায়নপর মর্দান আলির উদ্দেশে বলিল—আও শালা, বাদশা আলমগীরকা—

যে শব্দটি সে প্রয়োগ করিল তাহা সত্য বা সাহিত্য কোন কিছুর খাতিরেই লেখা সম্ভব নয়।

কিন্তু চিরদিন কাহারো সমান যায় না। এবারে গুলাব সিং-এর পালাইবার পালা আসিল। জেনারেল নীল ও হ্যাভলক কানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে সিপাহীদের সৌভাগ্যে ভাঁটা পড়িল। একদল লোক লইয়া মর্দান আলি গুজরানপুরে ফিরিয়া আসিল, খবর পাইয়া গুলাব সিং পলাইল। মর্দান আলি তাহার বাড়ীঘর লুটিল, নিজের জিনিষ তো পাইলই, উপরন্তু গুলাব সিং-এর শখের পিস্তলটি পাইল। তারপরে গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দূরগামী গুলাব সিংকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আও শালা রণজিৎ সিংকা—

নিরপেক্ষতার খাতিরে এ শব্দটিও বাদ দিতে বাধ্য হইলাম।

এবার আবার মর্দান আলির পলাইবার পালা। জেনারেল নীল ও হ্যাভলক সসৈন্যে লখনৌ যাত্রা করিলে কানপুর জেলা আবার অরাজক হইয়া উঠিল। মর্দান আলি গ্রাম ত্যাগ করিল, গুলাব সিং তাহার সখের পিস্তল উদ্ধার করিয়া বলিল—কবে শয়তানটাকে এর গুলিতে হত্যা ক'রতে পারবো।

তারপরে যখন স্যার কলিন ক্যাম্বেল প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী লইয়া কানপুরে উপস্থিত হইল মর্দান আলি গ্রামে ফিরিল, গুলাব সিং পলাইল, এবার সঙ্গে পিস্তলটি লইতে ভুলিল না। মোট কথা গুলাব সিং ও মর্দান আলির পরিবর্তমান সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে কোম্পানী ও সিপাহীপক্ষের ভাগ্যসূচী বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে না।

এই ঘটনার প্রায় একবৎসর পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণী পঠিত হইতে চলিয়াছে এবং তাহারাই ঠিক পূর্বাহ্ণে গুলাব সিং গ্রামে ফিরিয়াছে আর মর্দান আলি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চলিয়াছে।

৩

মর্দান আলি সদল বলে গুলাব সিং-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহার দলের একজন নাকড়া বাজাইয়া দিয়া হাঁকিল—

"খাল্‌ক-ই-খুদা
মুল্‌ক-ই-কোম্পানী বাহাদুর
হুকম্‌-ই-সাহিবান আলি শান্‌।"

মর্দান আলি স্বয়ং হাঁকিল, এ শালে দরবাজা খোল। গুলাব সিং দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া আছে। কোম্পানী বাহাদুরের দোহাই দেওয়াতেও দরজা যখন খুলিল না, মর্দান আলির ইঙ্গিতে সকলে মিলিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলিল। তখন সকলে দেখিতে পাইল চারপায়াখানার উপরে গুলাব সিং নির্বিকারভাবে বসিয়া আছে, বাহিরে আসিবার কোন লক্ষণ তাহার নাই।

মর্দান আলি বলিল—ওকে গ্রেপ্তার কর।

কিন্তু সিংহকে গ্রেপ্তার করিতে তাহার গহ্বরে প্রবেশ করিবে কে?

তখন অগত্যা মর্দান আলি খোদ খোলা তলোয়ার হাতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। গুলাব সিং তখনও নির্বিকার নিশ্চল। কিন্তু তারপরেই এক কাণ্ড ঘটিল। মর্দান আলি দরজার চৌকাঠের কাছে পৌঁছিবামাত্র গুলাব সিং তাহার সেই পিস্তলটি তুলিয়া তাহাকে গুলি করিল, অব্যর্থ গুলি মর্দান আলির বক্ষ ভেদ করিল, কিন্তু সে মাটিতে পড়িবার আগে গুলাব সিং এর গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তলোয়ারখানা আমূল তাহার বক্ষে বিঁধাইয়া দিল। এবার দুজনে পড়িল, একত্রে পড়িল, এক মৃত্যুর অতলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিরকালের জন্য তলাইয়া গেল।

এই ঘটনা এক লহমার মধ্যে ঘটিয়া গেল, মর্দান আলির সঙ্গীরা হতচকিত হইয়া সব দেখিল, তাহাদের করিবার কিছু ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ পাইলে তাহারা গুলাব সিং-এর বাড়ী লুট করিল,

লুঠিবার বড় কিছু ছিল না। তারপরে মৃতদেহ দুটি গরুর গাড়ীতে চাপাইয়া থানায় লইয়া আসিল। গুলাব সিং-এর পিস্তলটি সরকারী মালখানায় জমা হইয়া গেল।

৪

এই ঘটনার পরে কয়েক বছর চলিয়া গিয়াছে। কানপুরের পূর্বোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে চল্লিশ টাকা মূল্যে গুলাব সিং-এর পিস্তলটি কিনিয়া লইল। পিস্তলটির সঙ্গে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী জড়িত বলিয়া জানিত, সেইজন্য ঐ বস্তুটির প্রতি অনেক দিন হইতে তাহার লোভ ছিল।

কানপুর পরিত্যাগের কয়েক দিন আগে টাকার তাহার বাংলোর বারান্দায় বসিয়া আছে এমন সময়ে এক শিখ যুবক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াল, আর মৃত গুলাব সিং-এর পুত্র বলিয়া নিজ পরিচয় দিল।

টাকার বলিল—তোমার কি চাই?

সে বলিল—সাহেব, আমার পৈতৃক পিস্তলটি দিন।

সেটা তো আমি চল্লিশ টাকায় কিনেছি।

টাকা আমি ফেরৎ দিচ্ছি।

এখন টাকা ফেরৎ পেলেই বা আমি দেব কেন?

ওটা আমাদের পরিবারে ২।৩ পুরুষ আছে, অনেক স্মৃতি ওর সঙ্গে জড়িত।

সেই জন্যেই তো ওটা কিনেছি—

শিখ যুবকটি বলিল, সাহেব ওটা কাছে রাখলে আপনার অমঙ্গল হবে—

কেমন?

ঐ পিস্তলটার উপরে অনেকের লোভ ছিল। কতজনে কতবার চুরি ক'রেছে আর তাদের সকলেরই অমঙ্গল হয়েছে, শেষে তারা নিজে

এসে ফেরৎ দিয়ে গিয়েছে। পিতাজী বলতেন এ পিস্তল নিয়ে কেউ হজম করতে পারবে না। শেষবারের ঘটনা বলি সাহেব। মর্দান আলি আমাদের বাড়ী লুটে পিস্তলটা চুরি করেছিল। কিছুদিন পরে তার এক লায়েক ছেলে গুলিতে মারা পড়ে। মর্দান আলি বলত সিপাহীদের বন্দুকের গুলি, কিন্তু পিতাজী শুনে বলেছিলেন, ঐ পিস্তলের গুলিতেই সে মারা পড়েছে। কানপুর থেকে গুজরানপুরে ফিরবার পথে ছেলেটি মারা পড়ে। মৃতদেহের পিরাণের জেবে পিস্তলটি পাওয়া গিয়েছিল।

পিতাজী তখনই বলেছিলেন হয় পিস্তলের গুলি হঠাৎ ছুটে গিয়ে ছেলেটি মারা পড়েছে, নয়, মর্দান আলির কোন শত্রু পিস্তল কেড়ে নিয়ে তাকে খুন ক'রে ফেলে রেখে গিয়েছে।

পিস্তলটি নিয়ে গেল না কেন ?

এ দিকের সকলেই পিস্তলটির তুর্নাম জানত।

তোমরা পিস্তলটি ফেরৎ পেলে কি ক'রে ?

মর্দান আলি বাড়ী ছেড়ে পালালে আমরা ওটা উদ্ধার ক'রেছিলাম !

তখন টাকার বলিল, তোমার পিস্তলটি ফিরে দিতে পারলাম না বলে আমি তুঃখিত।

যুবকটি আর একবার পিস্তলটির শোচনীয় ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ম্লান মুখে প্রস্থান করিল।

টাকার বুঝিল লোকটি ধাপ্পা দিয়া পিস্তলটি ফেরৎ লইবার চেষ্টায় আসিয়াছিল।

অতঃপর টাকার বিলাত রওনা হইয়া গেল এবং পার্কার নামে তাহার পরিচিত এক সিভিলিয়ান কানপুর জেলার ভার গ্রহণ করিল।

পূর্বোক্ত ঘটনার বছর খানেক পরে পার্কার বিলাত হইতে একখানি পত্র ও একটি পুলিন্দা পাইল! পত্রখানি টাকার কর্তৃক লিখিত, টাকার লিখিতেছে যে পুলিন্দায় প্রেরিত পিস্তলটি যেন অবিলম্বে গুজরানপুরের মৃত গুলাবসিং-এর পুত্রকে ফেরৎ দেওয়া হয়। টাকার

সতর্ক করিয়া দিয়া লিখিয়াছে পার্কার যেন কোন অছিলাতেই পিস্তলটি ব্যবহার না করে এবং যত শীঘ্র সম্ভব উহা মালিকের হাতে পৌঁছাইয়া দেয়।

তারপর লিখিয়াছে—"আমার দেশে রওনা হওয়ার আগে গুলাব সিং-এর পুত্র এসে পিস্তলটি ফেরৎ চেয়েছিল। আমি উচিত মূল্যে কিনেছি এখন কেন ফেরৎ দেব বল্লে সে জানিয়েছিল যে ওদের বংশ ছাড়া অন্য সকলের হাতেই পিস্তলটি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়েছে। থানাদার মর্দান আলির পুত্রেরও নাকি ঐ পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল। আমি স্বভাবতই তখন গল্পগুলোকে হয় ধাপ্পা না হয় কুসংস্কার মনে করেছিলাম। যুবকটি যাবার সময়ে বারংবার আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, কিন্তু তখন কি দুর্বুদ্ধি যে চেপেছিল। পরে রক্তমূল্য দিতে হয়েছে। পিস্তলটি আমার অন্যান্য অস্ত্রপাতির সংগ্রহের সঙ্গে ডাইনিং রুমে রক্ষিত ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ফিরে দেখি আমার ছোট ছেলে বাগানের মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিহত হ'য়ে পড়ে আছে, পাশে পিস্তলটি। হয় তো খেলবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুলি এলো কোত্থেকে? ভিতরেই কি ছিল? আমার তো মনে পড়ে না, মনে পড়ে যুবকটির সতর্কবাণী, 'সাহেব এতে তোমার নিশ্চয় অমঙ্গল হবে।' যাই হোক, নির্বুদ্ধিতার রক্তমূল্য দিয়েছি, অশ্রুমূল্য এখনো গড়াচ্ছে, আমার স্ত্রী শোকে পাগলপ্রায়। তুমি মালিকের সন্ধান ক'রে পিস্তলটি অবিলম্বে তাকে অবশ্য অবশ্য ফেরৎ দেবে।"

পত্রখানি পড়িয়া পার্কার কৌতূহলের সঙ্গে পিস্তলটি লক্ষ্য করিল—তাহার মনে হইল কোন হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর জীর্ণ চোয়াল জোড়া দিয়া জিনিষটা প্রস্তুত। মালিকের সন্ধান করিবার জন্য তখনি সে জরুরি হুকুম জারি করিয়া দিল। *

* Havelock's march on Cawnpore—by J. W. Sherer.

ছায়া-বাহিনী

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি। তখন সমস্ত উত্তর ভারতে সিপাহি-বিদ্রোহ চলিতেছে। বিদ্রোহের আরম্ভ ১৮৫৭ সালের মে মাসে। আমরা তার কয়েক মাস পরের কথা বলিতেছি। ইতি-মধ্যে বৃটিশ বাহিনী দিল্লী পুনরাধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহার আগেই কানপুর তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, বড় সহরের মধ্যে লখনৌ তখনও বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত। স্যার কলিন ক্যাম্বেল লখনৌ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর একটি শাখা এলাহাবাদ হইতে অপর একটি শাখা কানপুর হইতে লখনৌ যাত্রা করিয়াছে। কানপুর হইতে লখনৌ অভিযাত্রী শাখাটিকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের গল্প। এই শাখাটির সেনাপতি হোপগ্রাণ্ট। দলের মধ্যে আছে লেঃ রবার্টস, তরুণ বয়স, এদেশে নবাগত। লেঃ রবার্টস পরে বৃটিশ ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ হইয়াছিল। গল্পটি আংশিক ভাবে তাহার আত্মজীবনীতে আছে।

এখন ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। কানপুরে সসৈন্যে গঙ্গা পার হইয়া হোপগ্রাণ্ট সংবাদ পাইল যে পলাতক নানা সাহেব মিঞাগঞ্জ নামক একটি গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। মিঞাগঞ্জ ২০ মাইল দূরে। হোপগ্রাণ্ট স্থির করিল যে মিঞাগঞ্জ অধিকার করিতে হইবে। সম্ভব হইলে নানা সাহেবকেও বন্দী করিতে হইবে। দুইদিন পরে হোপগ্রাণ্ট মিঞাগঞ্জের কাছে পৌঁছিল।

মিঞাগঞ্জ শহর বা দুর্গ নয়, একটি বড় গ্রামমাত্র। সেকালের অনেক গ্রামের মত এই গ্রামও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, গাঁথুনি কোথাও ইঁটের কোথাও মাটির, আর প্রাচীরের বাহিরে কতক অংশে একটি পরিখা, বর্ষাকালে জল থাকে, এখন শীতকালে কাদায় পূর্ণ। হোপগ্রাণ্ট আরও খবর পাইল দুই হাজার সিপাহী গ্রামটিতে আশ্রয় লইয়াছে,

তাহারাই প্রাচীরের উপরে কামান সাজাইয়া গ্রামটিকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহারাও খবর পাইয়াছে যে বৃটিশ সৈন্য আসন্ন।

বৃটিশ সৈন্য বিভাগ কামানের গোলায় প্রাচীর ধ্বসাইয়া দিল, কিভাবে গ্রামটি দখল করিল, এসব চিত্তাকর্ষক কাহিনী হইলেও, আমাদের গল্পের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় আমরা সে কাহিনী বলিব না। গ্রামটি দখল করিয়া হোপগ্রাণ্ট দেখিল সিপাহী কতক মরিয়াছে, কতক পলাইয়া গিয়াছে, পলাতকগণের সঙ্গে নানা সাহেবও উধাও হইয়াছে। তখন বৃটিশ সেনাপতি স্থির করিল যে গ্রামটি এমন ভাবে ধংস করিতে হইবে যে সে গ্রামে বিদ্রোহীরা আর আশ্রয় না লইতে পারে। গ্রামের বড় বড় বাড়ী ঘর ও অবশিষ্ট প্রাচীর ধ্বংস করিবার ভার পড়িল লেঃ রবার্টসের উপরে। রবার্টসের সঙ্গে ছিল তাহার আরদালী অঞ্জন তেওয়ারী। রবার্টস পরে যখন কমাণ্ডার-ইন-চীফ হইয়াছিলেন, তখনো তাহার সঙ্গে অঞ্জন তেওয়ারী ছিল, আরদালিরূপে।

বৃটিশ সৈন্য বাড়ী ঘর ভাঙিতেছিল, যেখানে প্রয়োজন কামান ব্যবহার করিতেছিল, রবার্টস্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিতেছিল। এমন সময় একজন মুসলমান বৃদ্ধ আসিয়া তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল, বলিল, সাহেব আমার বাড়ীখানা রক্ষা কর, সর্ব্বনাশের ভরা আর আর ভারী করো না। সে বলিতে লাগিল আর অঞ্জন তেওয়ারী সাহেবকে বুঝাইয়া দিতেছিল।

সাহেব কালকে আমার মত সুখী কে ছিল? আজ আমার মত হতভাগা আর কে? কাল আমি পাঁচটি উপযুক্ত ছেলের বাপ ছিলাম, ঐ দেখ তাদের মধ্যে তিনজন ওখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তাদের মুখের উপরে মাছি উড়ছে, আর দুজন যে কোথায় গিয়েছে খোদা জানেন।

রবার্টস তাকাইয়া দেখিল একগাদা মৃতদেহের একান্তে একত্রে তিনটি যুবকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ মাছিতে কালো।

রবার্টস মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। চিত্রে ও কাব্যে যুদ্ধ অতিশয় রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তাহা মেলে কই ?

বৃদ্ধ বলিতেছিল, সাহেব, আমার বাড়ীখানা ধ্বংস হলে আমার শেষ অবলম্বন যাবে, তখন আমি এ বয়সে কোথায় যাবো ? হুজুর, আমার বাড়ীখানা রক্ষা করো, খোদা তোমার ভালো করবে, তুমি জঙ্গীলাট হবে।

রবার্টস তাহার বাড়ীখানা ধ্বংস না করিতে আদেশ দিল।

তখন বৃদ্ধ মাটির উপরে জানু পাতিয়া বসিয়া হাত আকাশের দিকে তুলিয়া অবোধ্য ভাষায় তারস্বরে কি যেন বলিয়া গেল।

বোধকরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, তবে তাহা খোদার উদ্দেশে না ভারতের জঙ্গীলাটের উদ্দেশে তাহা কেহ বুঝিল না, তবে সবাই দেখিল যে তখন তাহার বলিচিহ্নিত গাল বাহিয়া তরঙ্গিত অশ্রু বহিতেছে।

রবার্টস স্থান পরিত্যাগে উদ্যত হইলে বৃদ্ধ তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল এবং এক লহমা পরে বাহিরে আসিয়া বলিল—সাহেব এই পাথরখানা কাছে রেখে দাও, বিপদে আপদে তোমাকে রক্ষা করবে।

সকলে দেখিল তাহার প্রসারিত করতলের উপরে জামের বিচির আকারের একটি ছোট কালো পাথর।

বৃদ্ধ বলিল—সাহেব এর নাম 'মোল্লাকি পাথর'। এই পাথরের অনেক কুদরৎ।

সে আরও বলিল—এই পাথর যদি সঙ্গে থাকে আর বিপদের মুখে 'মোল্লাকি পাথর' যদি স্মরণ করা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সব মুস্কিলের আসান হয়।

তারপর সে পাথরটার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বলিয়া গেল। কোন্ প্রসিদ্ধ মোল্লা প্রথমে কাহাকে দিয়াছিল, কাহার কত সঙ্কট উদ্ধার হইয়াছে, তারপর কি ভাবে উহা তাহার কাছে আসিল ইত্যাদি। তখনও তাহার প্রসারিত করতলের উপরে কালো পাথরটা চকচক করিতেছিল।

বলাবাহুল্য রবার্টসের মোল্লাকি পাথরের উপরে বিশ্বাস হইবার কোনো কারণ ছিল না, তবে ঐ সামান্য উপহারটা না লইলে পাছে বৃদ্ধ মনে দুঃখ পায় তাই সে অঞ্জন তেওয়ারীকে উহা লইতে ইঙ্গিত করিল।

তেওয়ারী উহা সাগ্রহে লইয়া সযত্নে কুর্তির জেবের মধ্যে রাখিয়া দিল।

ইহাই গল্পটির আদিপর্ব্ব।

২

তারপর দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়াছে। হোপগ্রান্টের সৈন্যবাহিনী লখনৌ দিকে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

সেদিন মেঘনির্মুক্ত শীতের সকাল, তাজা রৌদ্রে মাঠ ভরিয়া গিয়াছে, যত দূর দেখা যায় রৌদ্রে ভাজা অবাধ মাঠ তার আর যেন শেষ নাই, কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আমের বাগান। লেঃ রবার্টস, ক্যাপ্টেন ওয়াটসন ও অঞ্জন তেওয়ারী মূল বাহিনী হইতে কিছু পিছনে পড়িয়াছিল, তাহাদের অশ্ব যথেচ্ছ মন্দ গতিতে চলিয়াছিল, তাড়া ছিল না তাই তাড়াতাড়ি ছিল না।

এমন সময়ে ওয়াটসন বলিয়া উঠিল, রবার্টস ঐ দেখ একটা নীল গাই!

তাই তো চল দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা। তেওয়ারী কহিল— হুজুর ওটা গাই গোরু, মারলে দেবতা রাগ করবেন।

রবার্টস বলিল—গোরু নয়, হরিণ, তোমরা ভুলক্রমে গোরু বলো, আর সব দেশে ওকে হরিণ বলে।

এই বলিয়া রবার্টস এবং ওয়াটসন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল, অগত্যা তেওয়ারীকেও ছুটিতে হইল।

নীল গাই যে হরিণ তাহাতে সন্দেহ নাই, গোরুর সাধ্য কি এমন বাতাসের আগে ছোটে। কখনও তিনজনে হরিণটির কাছে গিয়া পড়ে, আবার মুহূর্তের মধ্যে যেন মন্ত্রবলে কোন্ দূর দেশে চলিয়া যায়।

এমনি ভাবে ঘণ্টা দুই চলিল, সোয়ার থামিল, ঘোড়া থামিল, তাহার পর কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল কিন্তু নীল গাইয়ের নাগাল আর মিলিল না। নীল গাইটা মাঠের যেদিকে গিয়াছে সেখানটায় দৃষ্টি রাখিয়া তিনজন একটু থামিয়াছে, ঘোড়ার পক্ষে এই বিশ্রামটুকুর প্রয়োজন ছিল এমন সময়ে ওয়াট্‌সন চীৎকার করিয়া উঠিল, রবার্টস ঐ দেখ।

তিনজনে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল উত্তর দিকের দিগন্ত জুড়িয়া প্রকাণ্ড একটি অশ্ববাহিনী—সিপাহীদের।

পালাও, পালাও।

তিন জনে বিপরীতদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

তেওয়ারী বলিল—হুজুর, আমি আগেই বলেছিলাম দেবতারা রাগ করেন।

তাহারা তিনজন, সিপাহীদের অশ্বারোহী অনেক। কত হইবে পাঁচশো না হাজার। তিনজনের পক্ষে পাঁচশোর অনেক কমই যথেষ্ট।

ইহাদের ঘোড়া দুই ঘণ্টা ছুটিয়া ক্লান্ত। এখন সে কথা ভাবিয়া আর লাভ নাই, তাহারা পরস্পর ঘোড়ার পেটে জুতার কাঁটা বিঁধাইয়া দিতে লাগিল। ঘোড়াগুলাও যেন আসন্ন বিপদ বুঝিয়াছে, প্রাণপণে ছুটিতেছে।

শত্রুবাহিনী ক্রমেই কাছে আসিয়া পড়িতেছে। পাঁচশোর চেয়ে হাজারের কাছে হইবার সম্ভাবনা। তিনজনে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখে, তাহাতে একটু সময় যায়, ও ভাবে না দেখাই উচিত, কিন্তু না দেখিয়াও পারা যায় কই!

এবার শত্রু সৈন্য একশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, অবধারিত মৃত্যু।

তখন রবার্টস্ বলিল, তিনজনে আর একত্র থেকে লাভ নেই, তিন জনে তিন দিকে ছোট, হয়তো বা কেউ রক্ষা পেতে পারো। তিনজনে পরস্পরের দিকে শেষ বারের মত তাকাইয়া লইয়া প্রাণপণে ঘোড়ার পেটে কাঁটা বিঁধাইয়া দিল, সিপাহীদের হাতে বিপক্ষের কি মর্ম্মান্তিক

দশা হয়, তিনজনে তাহার বহু ঘটনার সাক্ষী। নাঃ আজ আর রক্ষা নাই। এবার বোধ করি উহারা পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনি খোলা তরোয়াল সবেগে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে।

এমন সময়ে তেওয়ারির কি মনে হইল জানি না, সে জোরে চিৎকার করিয়া উঠিল—মোল্লাকি পথ্‌থর! মোল্লাকি পথ্‌থর! এমন বিপদের মধ্যেও রবার্টস না হাসিয়া পারিল না। কিন্তু একি

—হুজুর খোদার কুদরৎ। দুশমন কোথায় গেল!

—তাইতো একি হ'ল!

—জাদু না চোখের ভুল।

তিনজনেই দেখিল, তেওয়ারী সকলের আগে দেখিয়াছে, শত্রু সৈন্যর চিহ্নমাত্র নাই, সমস্ত বাহিনীটা দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীর গর্ভে যেন ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনজনে ঘোড়া থামাইয়া দাঁড়াইল।

তাইতো ব্যাপার কি? চোখের ভুল হইতেই পারে না, এক সঙ্গে তিনজনের এমন ভুল হয় না।

ওয়াট্‌সন বলিল, হিন্দুস্থানের জাদু।

রবার্টস্‌ বলিল—মরীচিকা।

মরীচিকা যদি হয় তবে আর দেখা দিচ্ছে না কেন?

জাদুতে বিশ্বাস করিলে কাজ চলে না।

তেওয়ারী বলিল, হুজুর দেবতারা রাগ করে ছিলেন, মোল্লাকি পথ্‌থর বাঁচিয়ে দিয়েছে।

মোট কথা ঘটনাটি সে সময়ে যেমন রহস্যময় ছিল শেষ পর্যন্ত তেমনি থাকিয়া গেল, সকলের বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত আর হইল না।

৩

তারপর ত্রিশ বছর চলিয়া গিয়াছে। মিঞাগঞ্জের বৃদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া তরুণ রবার্টস এখন হিন্দুস্থানের বৃদ্ধ

জঙ্গীলাট। সেদিনের ঘটনা বিবৃত করিতে বসিলে লর্ড রবার্টস ব্যাপার-টাকে মরীচিকা বলিয়া উড়াইয়া দেয়!

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা জঙ্গীলাটের অল্পবয়স্ক আরদালী চাপরাশী মহলে বৃদ্ধ অঞ্জন তেওয়ারী যেদিন এই গল্পটা বলে, সবাই জিজ্ঞাসা করে, চাচাজী ব্যাপার কি?

তেওয়ারী কোন কথা না বলিয়া অভ্যস্ত মতো ধীরে ধীরে উঠিয়া পুরাতন টেবিলের দেরাজ খুলিয়া একটি ছোট কালো পাথর বাহির করিয়া প্রসারিত করতলের উপরে সযত্নে রক্ষা করিয়া বলিয়া উঠে— মোল্লাকি পথ্থর।

যুবকের দল মুখ টিপিয়া হাসে, তেওয়ারীর চোখে তাহা পড়ে না, ঘরের আলো নিস্তেজ, আর তাহার চোখের আলোও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে।

মাদলিন, এই সময়ে চিঠিটুকু সেরে নাও, এখন ওরা কেউ নেই।

চেষ্টা তো করছি মিসেস অর। কিন্তু যে রকম কাগজ আর লেখনী—

কেন, তোমার কাগজ তো মন্দ নয়, বাইবেলের শাদা পৃষ্ঠাটুকু তো ভালই।

কিন্তু লেখনী! কাঠি পুড়িয়ে কালো করে নেওয়া। কখনো অক্ষর পড়ে না, কখনো বা মুচ করে ভেঙে যায়। হাসিও পায় কান্নাও আসে।

কি আর করবে? যেমন অবস্থা এর চেয়ে ভালো পাবে কোথায়? এতদিন যে ওরা মেরে ফেলে নি এই কি যথেষ্ট নয়?

মেরে ফেললে এর চেয়ে কি খারাপ হ'ত? তাছাড়া সে সময় তো যায় নি।

বোধ হয় গিয়েছে, কাল রাতে বোধ করি কামানের শব্দ শুনেছি।

বর্ষাকাল, মেঘের ডাক মিসেস অর।

কি যে বলো মাদলিন! এত বয়স হ'ল, মেঘের ডাক আর কামানের আওয়াজের তফাৎ বুঝবো না! নিশ্চয় জেনো ও কোম্পানীর কামান, আমাদের উদ্ধারের জন্য ফৌজ আসছে।

সেই আশা করতে করতেই তো তিন মাস গেল। আমার আর আশা করতে ভরসা হয় না।

তবে ভগবানের উপরে ভরসা করো।

তার চেয়ে চিঠিটুকু সেরে ফেলা যাক।

মাদলিন চিঠি লিখিতে লাগিল, মিসেস অর চুপ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস অর আবার মুখ খুলিল—বলিল, মাদলিন ফরাসী ভাষায় লিখো, ইংরাজীতে লিখলে সিপাহীদের হাতে পড়লে বুঝতে পারবে।

সিপাহীদের হাতে ছাড়া পাঠাবে কি উপায়ে ?

সে কথা সত্যি ; কিন্তু ওদের মধ্যেও তো ভালো লোক আছে, যেমন ঐ ওয়াজেদ আলি।

ওয়াজেদ আলির নাম শুনিয়া মাদলিন হাসিল।

কিছুক্ষণ পরেই আবার মিসেস অর বলিয়া উঠিল, লুকোও, চিঠি লুকোও, ঐ শোনো পায়ের শব্দ।

মাদলিন কান পাতিয়া শুনিল, সত্যই পায়ের শব্দ, খড়ের গাদার তলে কাগজের টুকরাখানা ও পোড়া কাঠিটা সযত্নে রাখিয়া দিল।

ওয়াজেদ আলি প্রবেশ করিল। মিসেস অর এক গাল হাসিয়া বলিল—কি দারোগা সাহেব, শহরের খবর কি ?

ওয়াজেদ আলি মাদলিনের দিকে তাকাইয়া মিসেস অরের প্রশ্নের উত্তর দিল—খবর ভালো। বোধ করি কোম্পানীর ফৌজ কাছাকাছি এসে পড়েছে, শহরের অনেকে দক্ষিণ দিকে কামানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

কেমন মাদলিন আমি বলি নি ?

ওয়াজেদ আলি, আমাদের এক টুকরো চিঠি কোম্পানীর ফৌজের হাতে পৌঁছে দেবে ?

আদেশ ও অনুরোধের মাঝামাঝি সুরে কথাগুলি বলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া মাদলিন হাসিল, তেমন হাসি ষোল বছরের নীচে ত্রিশ বছরের উপরে কোন সুন্দরী মেয়েতেও হাসিতে পারে না।

তাহার কাছে আসিয়া স্বর নীচু করিয়া ওয়াজেদ আলি বলিল, আপনার কোন্ কথা রাখি নি, জান কবুল করে রেখেছি, এখন সিপাহীরা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

তোমার কোন বিপদ ঘটবে না তো ওয়াজেদ আলি ?

আপনাদের বিপদ ঘটবার আগে নয়।

এবার রক্ষা পেলে তোমাকে ভুলবো না। এই বলিয়া দুজনে হাসিল।

মিসেস অর সে হাসি লক্ষ্য করিল। সে প্রাচীন হইয়া পড়িলেও এ হাসির অর্থ যে না বোঝে, তাহা নয়। বয়সকালে সে এইরকম হাসি কত হাসিয়াছে। ইংরেজ তরুণ-তরুণীর মধ্যে এই রকম হাসি-বিনিময় হইতে সে দেখিয়াছে। কিন্তু একজন নেটিভের সঙ্গে এই রকম হাসি-বিনিময়? অন্য সময় হইলে রাগে তাহার গা জ্বলিত। কিন্তু এখন হয়তো ঐ হাসির ক্ষীণ সূত্রেই তাহাদের জীবন ঝুলিয়া আছে। সে ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছে ওয়াজেদ আলির তাহাদের প্রতি দয়ার কারণ জীবে প্রেমও নয়, তাহার মতো প্রাচীনাকে রক্ষাও নয়, অন্য কিছু। তাহার মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল, খড়ের আঁটির উপাধান মাথার নীচে টানিয়া লইয়া সে শুইয়া পড়িল। তাহার মন ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে চলিয়া গিয়াছে, লখ্‌নৌ শহর, কাইজারবাগের বন্দীশালা কোথায় মিলাইয়া গেল। ইংলণ্ড, কেণ্ট প্রদেশের ক্ষুদ্র এক গ্রাম, ঘাসে-ঢাকা মাঠের মধ্যে ফুল-ঝরা গাছের তলায় তরুণী পা ছড়াইয়া উপবিষ্ট, পাশে তরুণ যুবক অর।

যুবক বলিতেছে, আমার আশা কি সফল হবে না কেটি?

তরুণী নীরবে হাসিল।

হাসির মতো এমন ভাষা থাকিতে মানুষে কতকগুলো বাজে কথা বলিতে যায় কেন?

২

তিনমাস আগে সিপাহী বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিলে মাদলিন জ্যাকসন ও মিসেস অর আরও সাতজন নরনারীর সঙ্গে যখন সীতাপুর ত্যাগ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ব্যাপারটা দু-এক সপ্তাহেই মিটিয়া যাইবে। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে অনির্দিষ্ট পথযাত্রাকে তাহাদের একপ্রকার পিকনিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। বন্দিগড়ের রাজার আশ্রয় তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল। রাজা প্রথমে তাহাদের আদরযত্ন করিত; কিন্তু কোম্পানীর শাসন যতই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তাহার ব্যব-

হারও কঠোর হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন রাজা জানাইল যে, এখানে আর তাহাদের থাকা নিরাপদ নয়, এক প্রতিবেশী রাজার রাজ-ধানীতে যাত্রা করিতে হইবে। খান দুই গরুর গাড়ীতে চাপিয়া সেই নয়জন ইংরেজ নরনারী যাত্রা করিল, সম্মুখে বন্দুকধারী দেড়শ সিপাই, একটা কামান, পিছনে বন্দুকধারী দেড়শ সিপাই, একটা কামান। সেই ক্ষুদ্র দলটি অচিরে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা বন্দী। কিন্তু তাহাদের গন্তব্য স্থান কোথায়? অচিরে তাহাও প্রকাশ পাইল—লখ্নৌ শহর। লখ্নৌ তখন বিদ্রোহীদের আয়ত্তে এবং ঐ অঞ্চলে সিপাহীদের প্রধান আড্ডা। অবশেষে অশেষ কষ্ট ও অপমান সহ্য করিয়া মাসখানেক পরে তাহারা লখ্নৌ শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর কাইজারবাগের অন্ধকার এই ঘরটিতে বন্দী-জীবন আরম্ভ করিল। খড়ের গাদা শয্যা, সারাদিনে একমুঠা অন্নখাদ্য। এত কষ্ট, এত গ্লানি, এত অপমান, তবু কেহ মরিল না। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন। দুঃস্বপ্নের মতো এসব মাদলিনের মনে পড়িয়া যায় তখন সে চোখ বুজিয়া, দু হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া থাকে। হঠাৎ পদশব্দে তাকাইয়া দেখিতে পায় রক্ষী ওয়াজেদ আলি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। প্রথম প্রথম তাহার বিরক্তিবোধ হইত, এখন ভালোই লাগে। অভ্যাসে শয়তানকেও সহ্য হইয়া যায়, ওয়াজেদ আলি সুপুরুষ, যুবক আর দয়াশীল। মাদলিন প্রথমে মনে করিত এই রক্ষী যুবকের সঙ্গে একটু হাসিয়া কথা বলিতে ক্ষতি কি, তাহাতে সকলের বন্দীজীবন হয়তো একটু সুসহ হইবে; কিন্তু মন কি প্রয়োজনের অধীন? মন লইয়া খেলাইতে গেলে তাহার ছোবল কোথায় পড়িবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু এসব তো পরের কথা, আগের কথা আগে।

৩

মাদলিন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, সঙ্কল্প করে যে দুঃখ-দিনের বিভীষিকা স্মরণ করিবে না, কিন্তু সাধ্য কি! অবাঞ্ছিত মাছিটা যেমন

ঘুরিয়া ফিরিয়া মুখের উপরে আসিয়া বসে, তেমনি দুঃসময়ের স্মৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনের মধ্যে উদিত হইতে থাকে।

মাদলিনের বাপ-মা থাকিত মীরাটে, সে সীতাপুরে মিসেস অরের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিল, এমন সময়ে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া ওঠে। হঠাৎ সীতাপুর পরিত্যাগ করিতে হইল, বাপ-মায়ের সংবাদ তারপরে আর সে পায় নাই।

বন্দিগড়ের রাজবাড়ি প্রকাণ্ড, চারদিকে তার প্রশস্ত পরিখা। গরুর গাড়িতে চড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা, সামনে পিছনে সশস্ত্র সিপাই, তাহাদের মুখে কি বিদ্বেষ! সেই সব মুখে সে নিজেদের বিরূপ ভাগ্যলিপি পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে গ্রাম, কৌতূহলী জনতা, কোথাও বা উদাসীন কোথাও বা হিংস্র। রাত্রিবেলায় সে ভয়ে ভয়ে থাকিত, কিন্তু না অন্তত সে বিপদটা ঘটে নাই। দূরে লখনৌ শহরের সৌধচূড়া। ক্রমে সেখানে আসিয়া তাহারা পৌঁছিল। তারপরে কাইজারবাগের বন্দীশালা, অন্ধকার, বৃহৎ দরজায় সশস্ত্র পাহারা। খড়ের গাদায় শুইয়া বসিয়া দিন আর কাটে না, একটানা, একঘেয়ে ; অন্ধকার এবং অধিকতর অন্ধকারের দ্বারা বিশিষ্ট দিন-রাত্রির পালা। একদিন সকালে একদল সিপাহী আসিয়া তাহাদের সঙ্গী ও যথার্থ রক্ষক পুরুষ ছয়জনকে হাত বাঁধিয়া লইয়া গেল। কোথায়? কেহ জানে না। কেন? জেনারেলের হুকুম। সিপাহী জেনারেলের। কিছুক্ষণ পরে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ। তবে কি? নিশ্চয়ই। কিন্তু সিপাহীরা যে বলিয়াছিল সাহেবদের ক্ষতি হইবে না। সিপাহীদের কথায় বিশ্বাস কি? বন্দীরা আর ফিরিল না। ওর পরে আর ফেরে কি উপায়ে? মাদলিনের বুকের মধ্যে নিশ্বাস ঠেলিয়া ওঠে। কিন্তু ঐ কচি মেয়ে সোফিটাকে বাঁচাইবার উপায় কি? ও যে খাদ্য বিনা মারা পড়িবে, শুকনো রুটি আর ভাত কি ওর সয়? তখনি আর একখানা মুখ ওর মনে পড়ে, সে মুখে বিদ্বেষ বা বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন নাই, বরঞ্চ যেন......ওয়াজেদ আলির মুখ। লোকটা এক সময়ে নবাব সরকারে দারোগা ছিল, সিপাহীদের বিশ্বাস-ভাজন। মাদলিনের কেমন যেন বিশ্বাস হইয়াছিল এর উপরে আস্থা

স্থাপন করা যায়। বুড়ি মিসেস অর কতই না নিষেধ করিয়াছিল। বুড়ির চোখ কি তরুণীর চোখের মতো সব কিছু দেখিতে পায়? মাদলিন নিজেই প্রস্তাব করিয়াছিল, সোফিকে বাঁচানো যায় কিনা?

ওয়াজেদ আলি বলিয়াছিল, কেন এখানে থাকলে ক্ষতি কি?

আমাদের যদি মেরে ফেলে?

কে মারবে?

সিপাহীরা।

আমি নিজেও তো একজন সিপাহী।

পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানিতে রাঙা একটি দাড়িম্বের বীজ বিকশিত করিয়া মাদলিন বলিল—দারোগা সাহেব, হুকুম হলে তুমিই মারবে।

এখন আর সে দারোগা সাহেব বলে না, নাম ধরিয়া ডাকে।

ওয়াজেদ আলি বলে, বেআইনী হুকুম মানবো কেন?

নইলে গর্দান যাবে যে!

একবার নোকরি গিয়েছে, এবারে না হয় গর্দান যাবে।

নোকরি গেল কেন?

সে অনেক কথা, আর একদিন বলবো।

ক্রমে এই দুই জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, মিসেস অর ব্যাপারটা একেবারে বরদাস্ত করিতে পারে না, বলে—মাদলিন, এ কি রকম আচরণ? একজন 'বৃটিশার' হয়ে একজন নেটিভের সঙ্গে মেলামেশা। ছিঃ!

মাদলিন বলে ওকে একটু খুশী রাখলে ক্ষতি কি? তা ছাড়া লোকটা তো মন্দ নয়।

সিপাহী আবার ভালো।

সব ইংরেজ কি ভালো?

আবার আর এক সময়ে গল্পের ছিন্নসূত্র জোড়া লাগে। লখনৌর নবাবদের কথা ওয়াজেদ আলির মুখে শোনে মাদলিন। শেষ নবাবের নাম ওয়াজেদ আলি শুনিবার পরে মাদলিন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে নবাব সাহেব বলিয়া ডাকিত।

ওয়াজেদ আলি বলিত, মেম সাহেবের মরজি হ'লে কি না সম্ভব হয়, একেবারে দারোগা সাহেব থেকে নবাব সাহেব।

ওয়াজেদ আলির কাছে সে নবাবের চিড়িয়াখানার কথা শুনিত, জন্তু জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা শুনিত, নবাবদের অত্যাচার ও বদান্যতার কথা শুনিত, একজন ইংরেজ ক্ষৌরকার কিভাবে নবাবদের দক্ষিণহস্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল শুনিত, মাদলিনের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। পাশে বসিয়া মিসেস অরও শুনিত কিন্তু মাদলিন কখনো তাহার চোখে সমর্থন খুঁজিয়া পায় নাই।

ওয়াজেদ আলি রাজী হইল, বলিল, সোফিকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে এক দোস্তর বাড়ীতে রেখে দেবো।

তারপরে?

কোম্পানীর ফৌজ এসে লখনৌ অধিকার করলে তাকে বের করলে হবে।

আমাদের জয় সম্বন্ধে তোমার দেখছি কোন সন্দেহ নেই।

কারই বা সন্দেহ আছে? প্রতিদিন দলে দলে সিপাহীরা শহর ছেড়ে নিজ নিজ গ্রামে চলে যাচ্ছে।

কেন?

গুজব এই যে জেনারেল হ্যাভলক কানপুরে এসে পৌঁছেছে।

বটে।

তারপরে একদিন সোফির মুখ হাত পা ভূষো মাখাইয়া কালো রঙ করিয়া ফেলা হয়। একজন মুসলমান স্ত্রীলোক সোফিকে কাপড়ে জড়াইয়া তারস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইয়া যায়—মেয়ে মরিয়াছে কবর দিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

মিসেস অরের সন্দেহ কিছুতেই যায় না, বলে মেয়েটারও পুরুষ-গুলোর দশা হবে।

এখানে থাকলেও ক্রমে তাই হ'তো।

কেন আমরা কি বেঁচে নেই?

ক'দিন আছি কে জানে।

কেন?

হয়তো পুরুষগুলোর দশা হবে।

হোক এমন কি মন্দ।

মিসেস অর বদমেজাজী কিন্তু ভীরু নয়।

৪

হঠাৎ ওয়াজেদ আলি ছুটিয়া আসিয়া বলে, মেম সাহেব চিঠিখানা দাও।

কেন?

কেন আর কি? সুসংবাদ। কোম্পানীর ফৌজ আলমবাগে এসে পৌঁছেছে।

আলমবাগ কতদূরে?

কোম্পানীর ফৌজ ঠিক জানো তো?

সব ঠিক, এখন চিঠিখানা দাও বেহাত যেন না হয়।

মিসেস অরের সন্দেহ কিছুতেই যায় না।

ওয়াজেদ আলি সেই চিঠিখানা লইয়া প্রস্থান করে। মিসেস অর বলে—দেখো কার চিঠি কোথায় পৌঁছয়। মরে গেলেও সিপাইকে বিশ্বাস করতে নেই।

ভাঙা নৌকায় করে কেউ কি কখনো নদী পার হয় নি?

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভারী বুট জুতার শব্দ ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে কাপ্তেন মেনিল আর লেঃ বগ্‌ল, সঙ্গে একদল গুর্খা। ওয়াজেদ আলির পত্রবাহকের আলমবাগ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, মাঝপথে এদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল।

মেনিল আর বগ্‌ল একযোগে বলিয়া ওঠে, গড্ সেভ দি কুইন। আশা করি সমস্ত কুশল।

ধন্যবাদ।

মেনিল শুধায়, এ লোকটা কে?

মাদলিন বলে, ওয়াজেদ আলি আমাদের রক্ষক, বড় ভালো লোক।

মেনিল ওয়াজেদ আলিকে বলে, একখানা পাল্কী জোগাড় করে আনো।

পাল্কী পাওয়া যাবে কিন্তু বেহারা?

বেহারার কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের গুর্খা সৈন্যরা আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওয়াজেদ আলি পাল্কী সংগ্রহ করিয়া আনে। মেনিলের নির্দেশে মাদলিন ও মিসেস অর পাল্কীতে চাপে। মেনিল গুর্খাদের নির্দেশ দেয় আলমবাগ, জেনারেল উট্রামের ক্যাম্প।

পাল্কীতে উঠিবার আগে মিসেস অর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ওয়াজেদ আলিকে দগ্ধ করিয়া দেয়, কূলে উঠিয়াছে এখন আর কৃতজ্ঞতার অভিনয় করিয়া কি ফল।

পাল্কীর ভিতর হইতে মাদলিন হাত বাড়াইয়া ওয়াজেদ আলির হাতখানা গ্রহণ করে, একটু চাপ দেয়, বিদায়-বেদনাকে পরিহাসের তির্যক পথে চালনা করিয়া দিয়া বলে, আবার কবে দেখা হবে নবাব সাহেব, কি দেখা করবে তো, অবশ্য দেখা ক'রো।

হাতের ঐ চাপটুকু মিসের অরের নজর এড়ায় না, চাপা স্বরে বলে—শেম।

মার্চ অন্।

পাল্কী রওনা হয়।

ওয়াজেদ আলি মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, পাল্কীর দিকে তাকাইতেও ভুলিয়া যায়। সে দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইত দুই জোড়া চোখ তাহার প্রতি নিবদ্ধ, এক জোড়া ঘৃণায় জ্বল-জ্বল, আর এক জোড়া বেদনায় ছল্-ছল্।

৫

লাঙলে জমি চষিলে যেমন নীচের মাটি উপরে উঠিয়া পড়ে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে উত্তর ভারতের অবস্থার তেমনি সব ওলট পালট হইয়া

গেল। বিদ্রোহের আগে যেমনটি সাজানো ছিল বিদ্রোহের পরে পরিবর্তন ঘটিল। মানুষ যে কে কোথায় গেল তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। দলত্যাগী সিপাহীরা অনেকে তরাই ও নেপালে চলিয়া গেল, অনেকে নিজের জেলা ছাড়িয়া অন্য নামে অন্য জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের চেয়ে শহরগুলিতেই বিপর্য্যয় বেশি ঘটিল। ইংরেজদের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল চারিদিকে নানা অসম্ভব স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। সিপাহী ও কোম্পানী দুই পক্ষই চরম বর্বরতা করিল। মানবচরিত্র সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু আশা পোষণ করেন তাঁহারা সে বিষয়ে যত কম আলোচনা করেন ততই মঙ্গল।

প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড় থামিয়া গেলে গৃহস্থ যেমন বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিতে বাহির হয় উভয় পক্ষেরই সেই অবস্থা হইল। অনেকেরই সন্ধান মিলিল না, আবার অনেককে সব স্থান হইতে পাওয়া গেল।

ওয়াজেদ আলি মিস মাদলিন জ্যাকসনকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। মাদলিন বিদায় হইবার পরে ওয়াজেদ আলি তাহার আর কোন সংবাদ পায় নাই। ছায়া যেমন কখনো সঙ্গ ছাড়ে না, অন্ধকারে দেহের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, আলোতে এদিকে ওদিকে সঞ্চরণ করে মাদলিনের স্মৃতি দিনে রাত্রে তেমনি তাহার মনে লাগিয়াই রহিল। প্রথমে সে স্মৃতিকে গ্রাহ্য করিত না, পরে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নয়। ওয়াজেদ আলি বুঝিল মানুষের চেয়ে তাহার স্মৃতি প্রবলতর; মানুষকে এড়াইয়া চলা যায়, কিন্তু তাহার স্মৃতিকে? মাদলিনের প্রত্যেকটি কথাকে, ব্যবহারকে শত সহস্রবার সে এপিঠ-ওপিঠ করিয়া ঝাড়িয়া পিটিয়া দিয়াছে, প্রত্যেক-বার আশার আশ্বাসের প্রেমের নূতন নূতন শস্যকণা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার রোগখিন্ন, ভয়পাণ্ডুর মুখের সেই হাসি। সে হাসি ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে আর সেই যে বিদায়-কালে হাতের উপরে সে একটুখানি চাপ দিয়াছিল সেই স্থানে মুগ্ধ পুরুষ কতবারই না চুম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি জ্বালা

কমিয়াছে? কিছু মাত্র না। বরঞ্চ ঘৃতনিষিক্ত বহ্নির মতো তাহা অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই বহ্নির দাহ তাহার সমগ্র শরীরের শিরা উপশিরায় সঞ্চালিত হইয়া গিয়া অনুক্ষণ রী-রী করিতে থাকে। তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া বলে, ওয়াজেদ আলি বাউরা হইয়া গিয়াছে, ঘনিষ্ঠ দুই-চারজন দোস্ত যাহারা প্রকৃত ইতিহাস জানে তাহারা বলে মিসি বাবার শোকে ওয়াজেদ আলি মস্তানা হইয়া গিয়াছে। ওয়াজেদ আলি কিছুই বলে না, চুপ করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, বাহিরে কেবল বালুর স্তূপ, ভিতরে অনন্ত রসপ্রবাহ। অবশেষে একদিন রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া মিস মাদলিনের সন্ধানে সে বাহির হইয়া পড়িল।

৬

কাজটি সহজ নয়। প্রকাণ্ড দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ নরনারী কোথায় কে আছে কে বলিবে। তার উপরে মিস মাদলিনের ঐ নামটি ছাড়া আর কোন পরিচয় তাহার জানা নাই। তা ছাড়া একজন নগণ্য নেটিভের পক্ষে ইংরেজ মহিলার সন্ধানে বিপদও আছে। তখন জোর ধর-পাকড় চলিতেছে। সিপাহীপক্ষ-ভুক্ত হইয়াও ওয়াজেদ আলি যে কিভাবে বাঁচিয়া গেল সে এক রহস্য। আবার মাদলিনের সন্ধানে বাহির হইয়া অনেক স্থানে সরকারী লোকের হাতে সে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরীহ বাউরা বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে বুঝিতে পারিত কাজটি কত কঠিন। এক এক সময়ে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িত, মনে হয়ত মাদলিনকে খুঁজিয়া পাই-বার সম্ভাবনা বুঝি নাই। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ পুরুষের কখনো মনে হইত না যে আরও একটা সম্ভাবনা থাকিতে পারে। যদিই বা তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়! সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ইংরাজ নরনারীর গৃহ যে কাইজারবাগের বন্দীশালা নয়, এ আশঙ্কা তাহার মনে একবারও

উদিত হইত না, সে ভাবিত মিস মাদলিন ঠিক তেমনিভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবে বন্দীশালায় যেমন করিত। হাতের সেই স্থানটায় একবার চুম্বন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতে আরম্ভ করিত। সুখ প্রকৃতিস্থের জন্য নয়, এ সংসারে অপ্রকৃতিস্থরাই কিঞ্চিৎ সুখী।

ওয়াজেদ আলি প্রথমে কানপুরে গেল, সে জানিত যে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ নরনারী কানপুরে চলিয়া গিয়াছে। কানপুরে আসিয়া সন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে লখ্‌নৌ শহর হইতে আনীত সমস্ত অসামরিক ইংরেজ নরনারী এলাহাবাদে গিয়াছে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। ওয়াজেদ আলি এলাহাবাদে 'আসিল। সেখানে চার পাঁচ মাস কাটাইল, হোটেলে ক্যান্টনমেণ্টে কত স্থানেই না সন্ধান হইল, কখনো কখনো দু' একজন ইংরেজ তরুণীকে দূর হইতে দেখিয়া মুহূর্তের জন্য চমকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথায় মাদলিন! মরীচিকারও একটা অস্তিত্ব আছে, মাদলিন বুঝি তাহার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।

সেখানে এক হোটেলে খানসামার কাজ সে লইয়াছিল, খাওয়া পরা চলিবে, আর মাদলিনের সন্ধান যে ঐ সূত্রেই করিতে হইবে, তাহাও সে জানিত। সেখানে অন্য এক খানসামার কাছে গল্পে গল্পে শুনিল যে কানপুর হইতে ইংরেজ নরনারীর দল এলাহাবাদে তিন চার মাস থাকিয়া দেশের অবস্থা একটু শান্ত হইলে কলিকাতার দিকে যাত্রা করে। সেই দিন সন্ধ্যাতেই কলিকাতাগামী ডাকের গাড়ীতে সে স্থান করিয়া লইল। মাদলিনের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে সে একটি সোনার আংটি তৈয়ারি করিয়া লইয়াছিল, ডাক গাড়ীর মাশুল জোগাইতে সেটি বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ওয়াজেদ আলি ভাবিল না হয় তাহার সন্ধান পাইবার জন্যই দিলাম, তাহাকেই দেওয়া হইল। প্রেমিকের বিচিত্র যুক্তি। যথাসময়ে সে কলিকাতায় পৌঁছিল।

৭

সেদিন শনিবার। কিছুকাল সাহেবসুবোর সন্ধানে থাকিয়া ওয়াজেদ আলি বুঝিয়াছে যুদ্ধকাল ছাড়া অন্য সময়ে ইংরাজকে হয় তাড়িখানায় নয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে পাওয়া যায়। সে সরাসরি ঘোড়-দৌড়ের মাঠের দিকে চলিল। রেস কোর্সে পৌঁছিয়া সে দেখিল যে ঘোড়দৌড় শেষ হইয়া গিয়াছে,কিন্তু জনতা তখনো অপসৃত হয় নাই। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল বিশালবপু জেনারেল উট্রাম খুব দর কষাকষি করিয়া এক জেলের কাছে তপসি মাছ কিনিতেছেন। লখনৌ শহরে সে উট্রামকে দেখিয়াছিল। তাঁহার আশেপাশে গুচ্ছে গুচ্ছে অনেক ইংরেজ নরনারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে জেনারেল সাহেবের দর কষাকষি দেখিতেছিল। ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি এক গুচ্ছ হইতে গুচ্ছান্তরে ফিরিতেছিল মাদলিনের সন্ধানে। এমন সময়ে হঠাৎ তাহার বনিয়াদের মূল অবধি কাঁপিয়া উঠিল, সে দেখিল অদূরে একটি গুচ্ছের মধ্যে মাদলিন। কাইজারবাগের বন্দীশালার সেই রোগপাণ্ডুর ভীতিবিহ্বল তরুণী নয়, স্বাস্থ্যসৌভাগ্যে সমুজ্জ্বল কান্তিময়ী যুবতী। আর কেহ হইলে এ দুই যে এক বুঝিতে পারিত না। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টির অসাধ্য কি? ওয়াজেদ আলির মনে হইল লক্ষ নরনারীর মধ্যেও প্রথম দৃষ্টিতেই মাদলিনকে সে চিনিতে পারিত। তারপরে তাহার মনে হইল এখন কর্তব্য কি? সরাসরি তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইবে? না, না, তাহা সম্ভব নয়। নিজের চেহারা ও পোশাকের দিকে তাকাইয়া সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। এভাবে কেহ প্রেমপাত্রীর কাছে যায় না। লখনৌ পরিত্যাগের পর এই প্রথম সে নিজের দিকে দৃষ্টি দিল। কি হইয়াছে! মুখ শুষ্ক, চুল দাড়ি এলোমেলো, জামা ও পায়জামা ছিন্ন আর মলিন। সে স্থির করিল আজ গোপনে মাদলিনকে অনুসরণ করিয়া তাহার বাসস্থান দেখিয়া লইবে, আর আগামীকল্য সুপ্রভাতে সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রণয়িনীর সম্মুখে

নিজেকে উপস্থিত করিবে, প্রেমনিষ্ঠার চরম পুরস্কার দাবী করিবে। গোপনীয়তার দূরত্ব রক্ষা করিয়া সে মাদলিনকে অনুসরণ করিল এবং পার্ক ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে সে প্রবেশ করিল তাহা মনে মনে টুকিয়া লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

দীর্ঘ ভ্রমণপথে ওয়াজেদ আলি একটি ছোট ব্যাগ কখনো হস্তচ্যুত করে নাই, করিবার কথা মনেও ভাবে নাই। শুভলগ্নের জন্য ঐ ব্যাগটিতে কয়েকটি কাপড় সঞ্চিত ছিল, একটি চুড়িদার পায়জামা, একটি পিরান, একটি রেশমের আচকান, শাদা কাপড়ের উপরে কাজ করা একটি লখনৌ টুপি, জরির ফুল তোলা এক জোড়া নাগরা জুতা, একটু আতর, আয়না আর চিরুনি। এই পোশাকে সাজিলে তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়, কল্পনা নয়, স্বয়ং মাদলিন তাহাকে এইরূপ বলিয়া ছিল। একদিন এই পোশাকে সজ্জিত হইয়া বন্দীশালায় ঢুকিলে মাদলিন দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পরিহাস-মিশ্রিত উল্লাসে বলিয়াছিল, কুর্নিশ নবাব। ওয়াজেদ আলি মাদলিনের চোখে চকিতের জন্য সেই আভা লক্ষ্য করিয়াছিল, সুপুরুষ দর্শনে সুন্দরী রমণীর মনে অজ্ঞাতসারে যে-ভাব উপজাত হইয়া থাকে। সেদিনের কথা সে কখনো ভুলিতে পারিবে কি? তাই মাদলিনের সন্ধানে বাহির হইবার সময় ঐ পোশাকটি সে সঙ্গে লইতে ভোলে নাই। একদিন ঐ পোশাক পরিবার অবকাশ আসিবে, আবার মাদলিনকে চমকিত করিয়া দিয়া সৌন্দর্যের অভিবাদন সে আদায় করিয়া লইবে—ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস, তাহার সঙ্কল্প। সে ভাবিল আজ সেই শুভদিন সমাগত অথবা আগামীকল্য প্রভাতে সেই শুভদিন।

প্রতীক্ষায় দীর্ঘ রাত্রি আর শেষ হয় না। অনেকক্ষণ সে পোশাক-গুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, চুল দাড়ি ছাঁটিয়া

সুবিন্যস্ত করিয়াছে, এখন রাত্রি শেষ হইলে হয়। কিন্তু রাত্রি আর কিছুতেই নড়িতে চায় না। অবশেষে সে-রাত্রিও শেষ হইল। পূর্ব দিক একটুখানি ফিকা হইবামাত্র সে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করিয়া লইল, পোশাক পরিল, চুল দাড়ি সুসংস্কৃত ও সুবিন্যস্ত করিল, একটু খানি আতর মাখিল, তারপরে আয়না হাতে করিয়া ভোরের আলোয় নিজেকে একবার দেখিয়া লইল। মাদলিনের সেদিনের বিস্মিত উল্লাসের স্মৃতি মনে পড়িয়া তাহার ওষ্ঠাধরে পৌরুষের গর্বমিশ্রিত হাসির রেখা ফুটিল। জগতের সেই আলো-আঁধারির মুহূর্তে তাহার মনে হইল সুন্দরী মাদলিন যে সুপুরুষ ওয়াজেদ আলিকে ভালোবাসিবে তাহার চেয়ে সহজ ও সম্ভব আর কি হইতে পারে ?

স্বস্তির একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে সগর্বে পরম নিশ্চিন্তভাবে মাদলিনের আবাসের দিকে পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া রওনা হইল।

বেশিদূর যাইতে হইল না, পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত পৌঁছিতেই সে দেখিতে পাইল যে শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা মাদলিন শারদীয়া উষার মতো প্রতি পদ সঞ্চারে লাবণ্যবিক্ষেপ করিতে করিতে ময়দানের দিকে চলিতেছে। তাহার অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে উল্লাসে গর্বে ওয়াজেদ আলির মন ভরিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মাদলিন চলিয়া গেল। ওয়াজেদ বুঝিল এতদিন পরে দেখিয়া মাদলিন তাহাকে চিনিতে পারে নাই। মাদলিনের প্রত্যাবর্তনের আশায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু ক্ষণ পরে মাদলিন যখন ফিরিল সে আর দ্বিধা না করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং চোখে পরিচয়ের দ্যুতি প্রকাশ করিয়া অভিবাদন করিল। মাদলিন তাহার দিকে তাকাইল কিন্তু তাহার চোখে পূর্ব পরিচয়ের কোন স্মৃতি চমক মারিয়া গেল না, বিস্ময়ও কৌতূহলের মাঝামাঝি সুরে সে শুধাইল, কেয়া মাঙ্‌তা ?

'কেয়া মাঙ্‌তা' এ প্রশ্নের কি উত্তর সম্ভব ! কি উত্তর দিবে, আদৌ দিবে কি দিবে না ভাবিতে ভাবিতে মাদলিন অনেক দূর চলিয়া গেল। ওয়াজেদ আলি মূঢ়ের মতো হতচৈতন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। যখন

সম্বিৎ তাহার কিছু ফিরিল কানে শুনিতে পাইল—ও মড্, সো লেট টুডে।

উল্লসিত মাদলিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, বেটার লেট দ্যান নেভার।

কাম টু মাই প্লেস রব!

মাষ্ট আই ?

ইউ মাস্ট, ইউ নটি বয়।

পূর্ব মুহূর্তের ঘটনায় ওয়াজেদ আলির মন এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিল যে দুঃখবোধ করিবার মতো শক্তিও তাহার রহিল না।

অদূরবর্তী একটি গাছের দিকে তাহার চোখ পড়িল, দেখিল তাহার তলায় অনেকগুলি শালিখ জটলা করিয়া মারামারি ও কলরব করিতেছে, সেই দৃশ্য দেখিয়া সে এমন এক প্রকার কৌতুক অনুভব করিল যে, আর সব ভুলিয়া গিয়া সেই দিকেই অনন্যমনা হইয়া তাকাইয়া রহিল।

লেফটেন্যাণ্ট রবার্টস, প্রবিন ও ওয়াটসন ব্রেকফাস্টে বসিয়াছিল, এমন সময়ে রবার্টসের আরদালি অঞ্জন তেওয়ারী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সাহেব, পরশুদিন যে গোয়েন্দা এসেছিল আজ আবার সে এসেছে।"

রবার্টস একখানা ন্যাপকিনে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "উত্তম, তাকে নিয়ে এসো।"

অল্পক্ষণ পরেই একটা ছোকরাকে সঙ্গে করিয়া অঞ্জন তেওয়ারী ঢুকিল। লোকটা তিন গজী এক সেলামে সাহেবত্রয়কে অভিবাদন করিয়া রবার্টসের হাতে ছোট এক টুকরা কাগজ দিল। রবার্টস পড়িল কাগজে ইংরাজিতে লিখিত আছে, মিস মার্টিনডেল।

রবার্টস বলিল, "আশা করি, আমাদের ফাঁদে ফেলবার জন্য কৌশল নয়।"

প্রবিন বলিল, "হস্তাক্ষর ইংরাজি ছাঁদের।"

ওয়াটসন বলিল, "তাহলে আরও কিছু লিখিত থাকত, যেমন অত্যাচারের কথা, যাতে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।

রবার্টস বলিল, "ওয়াটসন, তোমার কথাই ঠিক।"

তিনজনে এবারে হিন্দুস্থানীতে লোকটাকে জেরা আরম্ভ করিল, অঞ্জন তেওয়ারী মাঝে মাঝে সাহায্য করিতে লাগিল।

"গ্রামটা কত দূরে ?"

"তা সাহেব আট দশ ক্রোশ হবে।"

"তুমি কখন রওনা হয়েছিলে ?

"কাল খুব ভোরে।"

"এত বেশী সময় লাগল কেন ?"

'লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে হয়। সিপাহীদের হাতে পড়লে কি আর রক্ষা থাকত !"

"কেন ?"

"ঐ কাগজের টুকরো খুঁজে পেলে আমাকে আস্ত রাখত না। সাহেব, সিপাহীদের তো চেন না।"

তাহার শেষ কথাটিতে তিনজনে হাসিয়া উঠিল, ভাবটা হাড়ে হাড়ে চেনে।

"তবে তুমি কোন্ সাহসে কাগজটা আনলে ?"

"এই সাহসে," বলিয়া সে কাপড়ের থলির মধ্য হইতে একটা বাঁশের বাঁশি বাহির করিল। বাঁশিটার গায়ে ছোট একটি ফাটল দেখাইয়া বলিল, "মেম সাহেব কাগজটাকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তার পরে আমি এইভাবে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে এলাম।" তার পরে পাছে সাহেবগণ ভাবে যে, সে বাঁশি বাজাইতে জানে না, তাই সে সোৎসাহে বাঁশিতে ফুঁ দিল।

অঞ্জন তেওয়ারী তাড়া দিয়া বলিল, "এই উল্লু থাম্।"

লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বলিল, "সাহেব, আমি নাচতেও জানি।"

প্রবিন হাসিয়া যাহা বলিল তাহার বাংলা করিলে দাঁড়ায়, খুব দীপ্তিমান বালক।

"তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ?"

"হেঁটে গেলে যাব।"

„আমরা ঘোড়ায় যাব।"

"তবে কি করে যাব ? ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে পারব কেন ?"

"তোমাকে ঘোড়া দেব, চড়তে জানো ?"

"ঘোড়ায় চড়তে জানি, হাতিতে চড়তে জানি, এমন কি গাছে চড়তেও জানি।"

সাহেব তিনজন হাসিয়া উঠিল।

অঞ্জন তেওয়ারী ধমক দিয়া বলিল, "চুপ রও উল্লু।"

রবার্টস ইংরাজিতে বলিল, "ওকে আগের দিনে যে-সব জেরা করে-

ছিলাম, আর একবার ক'রে দেখি সেদিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে কি না।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল, "গাঁয়ের কি নাম?"

"ছোট রামপুর।"

"সেদিন কি বলেছিলে?"

"সেদিনও ছোট রামপুর বলেছিলাম, ও-গ্রাম আজ পাঁচ শো বছর হল ছোট রামপুর।"

"ও মুসলমানদের গ্রামে তুমি কেন? তুমি তো হিন্দু।"

"কেন, গাঁয়ে কি গোরু নেই?"

"গোরুর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?"

"গোরু বা মুসলমানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি গোরু চরাই।"

"কেন মুসলমানে কি গোরু চরাতে জানে না?"

"না ওরা গোরু চরায় না, ওরা গোরু খায়।"

তিনজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। ওয়াটসন বলিল, "বাচ্চা ফলস্টাফ।"

"মিস মার্টিনডেল তোমাকে কি করে দেখল?"

"চোখ দিয়ে।"

"প্রবিন, সাবধানে জেরা কর, ও তোমার চেয়ে পাকা।"

"মেমসাহেব মুসলমানকে বিশ্বাস না করে তোমাকে বিশ্বাস করল কেন?"

"এতো অতি সহজ কথা। মেমসাহেব জানে কোন হিন্দু তাকে সাদি করবে না, তাই আমি খবরটা পৌঁছে দেব বলে তার মনে হয়েছিল।"

"যে মুসলমান ওকে নিয়ে গিয়েছিল, সে ছাড়াও তো গাঁয়ে অন্য মুসলমান ছিল।"

"সাহেব, দরকার হলে ওরা গাঁ সুদ্ধু একজনকে সাদি করে। সকলেরই মনে আশা আছে, তাই কে আর খবর দেবে।"

"তুমি যখন পরশু এখান থেকে ফিরে গেলে, মেমসাহেব কি বলল ?"

"আগে আমি কি বললাম শোন। বললাম, 'মেমসাহেব তোমার হাতের লেখা না পেলে সাহেবেরা আসবে না।' তারপরে অনেকক্ষণ কি ভেবে কোত্থেকে এই লেখা কাগজটুকু এনে আমার হাতে দিল।"

প্রবিন বলিল, "তুমি আমার কাছে নোকরি করবে ?"

"কি, লড়াই ?"

„না, আমার ছেলেমেয়েদের তদারক।"

"খুব পারব, গোরু চরিয়ে হাত পেকেছে।"

"তোমার নাম কি ?"

"ন্যাড়া গোপাল।"

"কাল যে শুধু গোপাল বললে ?"

"ভেবেছিলাম মাথা দেখেই বুঝতে পারবে, ওটা আর বলতে হবে না।"

সকলে আবার হাসিল। রবার্টস বলিল, "এখন তুমি অঞ্জন তেওয়ারীর কাছে থাকো গে, ঠিক সময়ে খবর দেব।"

অঞ্জন তেওয়ারীর সঙ্গে ন্যাড়া গোপাল বাহির হইয়া গেল।

রবার্টস বলিল, "খবর ঠিক বলেই মনে হয়।"

প্রবিন বলিল, "কোন সন্দেহ নেই।"

ওয়াটসন বলিল, "ছেলেটি খুব স্মার্ট।" তখন তাহারা স্থির করিল যে, রাত্রে এমন সময়ে রওনা হইতে হইবে যে, একেবারে ভোর রাত্রে গিয়া গ্রাম ঘেরাও করিতে পারে ; কেহ সন্ধান পাইবে না, কেহ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আরও স্থির হইল যে, তাহাদের তিন জনের সঙ্গে একদল অশ্বারোহী থাকিবে, আর সঙ্গে থাকিবে অঞ্জন তেওয়ারী ও গোপাল।

২

কাগজের টুকরা পাঠাইয়া দিয়া অবধি মিস মাটিনডেলের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সে ভাবিল গোপাল ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে তো, না তার আগেই সিপাহীদের হাতে পড়িবে। আবার কখনো ভাবে, গোপাল সিপাহীদের চর নয় তো? তাহাকে আপন ফাঁসে জড়াইবার উদ্দেশ্যেই লিখিত প্রমাণের দাবি করে নাই তো? তারপরে মনে হয়, না গোপালকে তো তেমন বলিয়া বোধ হয় না, ছোকরা যেমন সরল, তেমনি মজার, এমন লোক কি গোয়েন্দা হইতে পারে!

তখন তাহার মনে পড়ে অনেক কয়দিন হইল সে ছোকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, সন্দেহের কিছু দেখে নাই। কয়েকদিন আগে গাঁয়ের লোকের কানাঘুষায় সে জানিতে পারিয়াছিল যে ইংরেজ সৈন্য কানপুর হইতে লখনৌ চলিয়াছে। পাছে তাহারা এই গাঁয়ে আসিয়া পড়ে, একবার সকলের গ্রাম ত্যাগের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। পরে সকলে গ্রামেই থাকিয়া যায়। ইংরেজ সৈন্য পূব দিক দিয়া চলিয়া যাইবে, গ্রামে আসিবে না। তখন হইতে তাহার মাথায় গোপনে খবর দিবার বুদ্ধি আসে, কিন্তু উপায় কি? তখন গোপালের কথা মনে হয়, গোপালকে আগেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল। এবারে সে গোপালকে ডাকিয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে আলাপ জমাইল।

"গোপাল, কত বেতন পাও?"

"মেমসাহেব, আবার বেতন? আমার ন্যাড়া মাথা আস্ত থাকলেই ।"

"তোমাকে এরা বুঝি মারে?"

"মারে না! এরা আমাকে মারে, আমি এদের গোরুগুলোকে মেরে তার শোধ নিই।"

"অন্যত্র চাকুরি নাও না কেন?"

"কে আর চাকুরি দিচ্ছে ?"

"কেন, কোম্পানীর কাছে ?"

"কোম্পানী কি গোরু পোষে ?"

"অন্য কাজ দিতে পারে।"

"তবে জোগাড় করে দাও না।"

"সিপাহীরা তোমাকে খুন ক'রে ফেলবে না ?"

"সিপাহীর রাজত্ব আর কয়দিন ? কোম্পানীর সিপাহী এলো বলে।" তারপরে গলার স্বর নিচু করিয়া বলে—"কাছে এসে পড়েছে, লখনৌ যাচ্ছে।"

"যাও না, একবার দেখে এসো।"

"অমনি জানিয়ে আসব যে, তোমাকে আটক করে রেখেছে, কি বলো মেমসাহেব ?"

"সিপাহীরা যদি জানতে পারে, তোমাকে আমাকে দুজনকেই মেরে ফেলবে।"

"ন্যাড়া গোপালের পেট থেকে কথা আদায় করা বড় শক্ত, যমে পারে না।"

"তবে যাও না।"

অতঃপর গোপাল ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে চলিয়া যায়—আর ফিরিয়া আসিয়া লিখিত প্রমাণ দাবি করে।

মিস মার্টিনডেল ভাবিতেছিল ন্যাড়া গোপালের পেট হইতে যমে কথা আদায় না করিতে পারিলেও হাতের কাগজের টুকরা, তার জন্য যমের দরকার হইবে না, সিপাহীরাই যথেষ্ট। তারপরে ভাবিল, না, ছোকরা চালাক-চতুর আছে, ভয় নাই। তারপর আবার ভাবিল যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন আর দুশ্চিন্তা করিয়া কি ফল।

এমন সময়ে মনসুর প্রবেশ করিল। এই লোকটাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। দিনে রাতে দু'তিনবার সে দেখা দেয়, কখনো হাতে খাদ্য, কখনো চাবুক, অবাধ্য বশ করিবার উপায় মনসুর জানে বটে।

মনস্থরের হাতে খানকতক রুটি ছিল, মনস্থর বলিল, "কি বিবি, মত বদলেছে ?"

"মত আবার কিসের ?"

"সাদি করবে না চাবুক খাবে ?"

"তুমি বে-ইমান।"

"মারহাব্বা! বিবির তাগদ এখনো কমে নি দেখছি, রুটি ক'খানা ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"

"তোমার রুটির চেয়ে তোমার চাবুক ভালো। শয়তান!"

"এবারে ভুল হ'ল বিবি। শয়তানে বশ করে রুটি দিয়ে। মানুষ তা পারে না বলেই চাবুক মারে।"

"তাই মারো না।"

"কস্থর তো করি না।"

"ইউ স্কাউণ্ড্রেল!"

মনস্থর ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়সোয়ার ছিল, ইংরাজি গালাগালির মর্ম জানিত, বলিল, "খাব্স্থরত বিবির মুখের গালও খাব্স্থরত।"

মিস মাটিনডেল তাহাকে পদাঘাতের অভিনয় করিল।

মনস্থর রাগিল না, বলিল, "শোভানাল্লা! বিবির খাব্স্থরত পা দুখানার জন্যই তো সাদি করতে ইচ্ছা!"

মিস মাটিনডেল আর কিছু বলিবার না পাইয়া বলিল, "পা দুখানা।"

মনস্থর দমিবার পাত্র নয়, বলিল, "আরও কিছু।"

"বে-ইমান।"

"আবার বে-ইমান কেন ?"

"একশবার বে-ইমান। তুমি চুরি করে আমাকে এনেছ।"

"ভালো জিনিষই লোকে চুরি করে।"

"তুমি তখন কেন বলেছিলে যে নিরাপদ জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবে ?"

"তাই তো নিয়ে এসেছি। কানপুরের বিবিদের কি হয়েছে শুনেছ তো ?"

"তোমার মতো দুশমনের সঙ্গে সাদি হওয়ার চেয়ে সে অনেক ভালো।"

"সেই কথাটাই ভালো ক'রে জেনে যাই, এবারে কী নিয়ে আসব, তলোয়ার না মোল্লা ?"

মিস মার্টিনডেলের ধৈর্য ও শক্তি সাময়িকভাবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, মাদুরখানার উপরে পড়িয়া চাপা কান্নায় কাঁপিতে লাগিল।

মনসুর প্রস্থান করিল।

৩

স্বপ্নের মতো দুঃস্বপ্নের মতো কত স্মৃতিই না মিস মার্টিনডেলের মনে শোভাযাত্রায় চলিতে লাগিল।

সিপাহীরা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ও সমুদয় সিভিল লাইন লুট করিয়া লইয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে। সিভিল লাইনের একপ্রান্তে ম্যাজিস্ট্রেটের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের বাংলো। ঠিক সেই সময়টাতে মিস মার্টিনডেল প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। অন্যদিন অনেক আগে ফেরে, সেদিন হঠাৎ তাহার কুকুর 'পেট' ছুটিয়া গিয়া একটা দেশী কুকুরকে তাড়া করে। দুই কুকুরে অনেকক্ষণ ছুটোছুটি, কামড়াকামড়ি চলে। 'পেট' ফিরিয়া আসিলে, নিয়মিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে নদীগর্ভের বালুশয্যা ছাড়িয়া যখন সে উপরে উঠিল, দেখিল সিভিল লাইন জ্বলিতেছে। এক মুহূর্ত বিমূঢ় থাকিয়া সে ছুটিল।

"মেমসাহেব দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

সে ফিরিয়া দেখে মনসুর। মনসুর ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়সোয়ার। সুপুরুষ যুবক, তাহাকে সে চিনিত। প্রয়োজনকালে দু'চার দিন কথাও বলিয়াছে।

"এ সব কি মনসুর ?"

"সিপাহীদের কাণ্ড!"

"দাঁড় করালে কেন? বাড়িতে যাই।"

"না যাওয়াই ভালো।"

"কেন?"

"ওখানে গেলে তোমাকে আস্ত রাখত না।"

"কেন, আর সকলে? বাবা, মা, ভাই?"

"কেউ নেই।"

"কোথায় গেছে?"

মনসুর কথা না বলিয়া হাত তুলিয়া দেখাইল।

অবিশ্বাসের কারণ ছিল না, অনেক শহরে সিপাহীরা যে এমন কাণ্ড করিতেছে, মিস মাটিনডেল শুনিয়াছিল; সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, মনসুর ধরিয়া ফেলিল।

মনসুর তাহাকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকাইয়া রাখিল। তাহার অনুরোধে সে ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ঘাগরা ও বোরখা ধারণ করিল। মনসুর বলিয়াছিল যে, হাঙ্গামা থামিয়া গেলে তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। কয়েকদিন পরে সীতাপুর শহর লুটপাট করিয়া সিপাহীরা দিল্লী চলিয়া গেলে মিস মাটিনডেল বলিল, "মনসুর, এবার আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।"

"নিরাপদ কোথায়?"

"কেন, লখনৌ?"

"সিপাহীরা লখনৌ ঘেরাও করেছে।"

"তবে কানপুর?"

"সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ।"

"তবে—" পর্যন্ত বলিয়া সে আর দিশা পাইল না, চুপ করিয়া রহিল।

মনসুর বলিল, "শহর জায়গা ভালো নয়, আমাদের গাঁয়ে গিয়ে কিছুকাল থাকো, দেশের অবস্থা শান্ত হলে যেখানে বলবে পৌঁছে দেব।"

মিস মার্টিনডেল সহজেই রাজি হইল। সম্পদকালে যাহার সহিত বাক্য বিনিময় করিতেও দ্বিধাবোধ করিত, বিপদকালে আজ তাহাকেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া মনে হইল। মজ্জমান ব্যক্তির কাছে শ্মশানের পোড়া কাঠও পরম আশ্রয়।

৪

এই বিচিত্র চরাচরে মানুষের মন সব চেয়ে বিস্ময়কর পদার্থ। মনের অস্তিত্বই ভগবানের অস্তিত্বের প্রধান প্রমাণ। আর সব পদার্থের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত হইতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম, বিচিত্র ও অভাবিতগতি মানুষের মন এমন একজন স্রষ্টার অপেক্ষা রাখে যিনি সূক্ষ্মতর, বিচিত্রতর এবং যাঁহার গতি অধিকতর অভাবিত। এমন যিনি তাঁহাকে জগৎস্রষ্টা ভগবান বলিলে ক্ষতি কি ?

নৌকার মাস্তুলে পাল খাটাইলে বাতাস লাগে, তার উপরে আর একখানা পাল খাটাইলে আরো খানিকটা বাতাস লাগে, আরো উঁচুতে আরো একখানা পাল খাটাইলে আরো একটু বাতাস লাগে, যত বেশি খাটাইবে তত বেশি বাতাস লাগিবে। মানুষের মন নৌকার মাস্তুলের মতো, কিন্তু সব মনের পালের সংখ্যা সমান নয়। যাহার পালের সংখ্যা যত বেশি সে-মন তত সূক্ষ্ম, তত বিচিত্র, তাহার গতি তত অভাবিত। ইহাতেই সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে ভেদ। তবে সাধারণ মানুষের পালের সংখ্যাও মন্দ নয়। নিয়মিত চালে চলিবার সময়ে মানুষে মনের পালের সংখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চয় থাকে না, কিন্তু অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে অভাবিত অবস্থার মধ্যে পড়িবামাত্র মনের নূতন নূতন পাল সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া ওঠে, সেই সঙ্গে তাহার গতিবিধিও বিচিত্র হইয়া ওঠে।

মনসুর নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষ। যখন সে বিপন্ন মিস মার্টিনডেলকে রক্ষা করিয়াছিল, প্রাথমিক পালের হাওয়ার চালেই করিয়া-

ছিল। আবার যখন সে তাহাকে তাহার স্বগ্রামে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল, তখনও খুব সম্ভব সেই পালের ইঙ্গিতেই কাজ করিয়াছিল। কিন্তু তারপরে গাঁয়ে আসিয়া পড়িয়া তাহার মন যত নূতন নূতন পাল খাটাইতে লাগিল তাহার চরিত্র তত বিচিত্ররূপে দেখা দিতে থাকিল।

মিস মাটিনডেলকে গ্রামে আনিবার পরে বুঝিল যে কোম্পানীর রাজত্ব সত্যই যাইবার মুখে, আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার আশা নাই। তারপর মনে হইল পিতৃ-মাতৃহীন আত্মীয়স্বজনবিরহিত এই তরুণীটির কি হইবে, কোম্পানীর রাজত্ব থাকিলে না হয় তাহাকে গোরালোকদের সমাজে পৌঁছাইয়া দিলেই চলিত। প্রথমে তাহার মনে হইল মেয়েটি তাহার গলগ্রহ হইল। তারপরে আর একখানি অভাবিত পাল খাটাইয়া মন বলিল, গলগ্রহকে গলার মালা করিয়া লও না কেন? কথাটি মনে হইবামাত্র সে কেবল যে উল্লাস অনুভব করিল তাহা নয়, সামাজিক মর্য্যাদার উচ্চতর মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখিল। যদিচ কোম্পানীর রাজত্ব শয়তানি, তাই বলিয়া ইংরাজের মেয়ে তো মন্দ নয়। কোম্পানীর চাকুরী করিলে মর্য্যাদা বাড়ে, মেম বিবাহ করিলেই বা বাড়িবে না কেন? তখন সে গ্রামে প্রচার করিয়া দিল যে, মেয়েটির সঙ্গে তাহার সাদি হইবে, দেশের অবস্থা একটু শান্ত হইলেই হয়। ক্রমে নিজের কল্পনার সুরায় নিজে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন আর তাহার তর সহে না। একদিন মিস মাটিনডেলের কাছে প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিল।

কোম্পানী-রাজ বুঝি যায়। মিস মাটিনডেল ইংরাজের মেয়ে; ভাঙে তবু মচকায় না। বলিল, "এমন আমাদের দেশের ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে, কোম্পানী-রাজ টলবে না।"

"কোম্পানী-রাজ কায়েম হলেই বা কি? তুমি যাবে কোথায়?"

"আমাকে কোন ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছে দিয়ো, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তোমার জন্য সর্ব্বদাই আমি চিন্তায় আছি।"

"মনসুর, তুমি সত্যই আমার খুব উপকার করেছ, তোমাকে কিভাবে ধন্যবাদ দেব জানি না।"

"ওটা তোমার মুখের কথা, মনের কথা নয়।"

"কেন, কেন ?"

"রক্ষাকর্তাকে কেউ ধন্যবাদ দেয় ? আরও বেশি কিছু দেয়।"

"আমি স্ব-সমাজে ফিরে গেলে তোমার যাতে বড় নোকরি হয় তা দেখব।"

"কেটি, আমি তোমার নোকরি করতে চাই।"

মিস মাটিনডেল বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ চমকিয়া উঠিল। 'তোমার নোকরি করতে চাই' ইহার একটা সাধারণ অর্থ আছে সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে নিজের আদরের ডাকনাম ও কণ্ঠের বিশেষ স্বর যুক্ত হইলে একটাই অর্থ হয়। বিস্ময়ে, ভয়ে, অপমানে, ক্ষোভে মিস মাটিনডেল চাপা আক্রোশে গর্জিয়া উঠিল, "মনসুর !"

ইহাই মনসুরের প্রণয় নিবেদনের প্রথম অধ্যায়। মনসুর বুঝিল বাদশাহীর ভগ্নস্তূপের উপরে উপবিষ্টা বলিয়া যাহাকে করায়ত্ত মনে হইয়াছিল সে তেমনি দুর্লভ হইয়া রহিল। স্তূপ ভগ্ন বলিয়া তাহার সোপানও ভগ্ন, আরোহণের উপায় নাই। টানিয়া নামানো যাইতে পারে বটে। মনসুরের মন আর একখানি অপ্রত্যাশিত পাল তুলিয়া দিল। এবারে সে তর্জন গর্জন ভীতিপ্রদর্শন উৎপীড়ন এবং অবশেষে প্রহার শুরু করিল। কিন্তু না নামিল ভগ্নস্তূপের সুন্দরী, না কমিল ভগ্নস্তূপের উচ্চতা। মনসুরের মনে যদি আরও দু'চারখানি পাল থাকিত, বুঝিতে পারিত যে, কেটি ভগ্নস্তূপের প্রান্তে লগ্ন সন্ধ্যাতারা, স্তূপ সমূলে ধসিয়া পড়িলেও সে এক তিলও কাছে আসিবে না।

"আরে শয়তানী, তুই গোপনে কোম্পানীর ফৌজকে খবর পাঠিয়েছিলি ?"

মনস্থরের অভিযোগ শুনিয়া মিস মাটিনডেল ছেঁড়া মাছুরের উপরে উঠিয়া বসিল. মনে মনে উল্লাস অনুভব করিল, অথচ কিছুই বোঝে নাই ভান করিয়া বলিল, "কি হয়েছে ? আমি বুঝতে পারছি না ।"

"এইবার বুঝবে—" সপাৎ সপাৎ দুই ঘা চাবুক তাহার শুভ্রদেহে নীলদাগ তুলিল।

"তোকে এখানে রেখে যাচ্ছি না শয়তানী", বলিয়া মনস্থর তাহার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল। বলে পারা যাইবে না বুঝিতে পারিয়া মিস মাটিনডেল তাহার সঙ্গে বাহির হইল, দেখিতে পাইল রাত্রিশেষের আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে লোকজন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ভুট্টা ক্ষেতের দিকে চলিয়াছে, মনস্থরের দ্বারা চালিত হইয়া সেও সেইদিকে চলিল।

কোম্পানীর ফৌজ গ্রাম ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। রবার্টস, প্রবিন ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল সিপাহী গ্রামে প্রবেশ করিল। সঙ্গে অঞ্জন তেওয়ারী, পথপ্রদর্শক ন্যাড়া গোপাল। তাহারা গ্রামে ঢুকিয়া দেখিল কোথাও জনপ্রাণী নাই, ঘর খালি. দরজা খোলা, ভিতরে না ঢুকিয়াই সব দেখিতে পাওয়া যায়।

রবার্টস শুধাইল, "একি লোক সব গেল কোথায় ?"

ন্যাড়া গোপাল বলিল "মানুষ তো পাখী নয় যে উড়ে পালাবে, কাজেই কোথাও আছে।"

"কিন্তু কোথায় ?"

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। হঠাৎ গোপাল বলিয়া উঠিল, "ঘরে না থাকলে ভাঁড়ার ঘরে আছে ?"

"সে আবার কোথায় ?

গাঁয়ের চারদিকে ভুট্টাক্ষেত। গোপালের পথপ্রদর্শকতায় সকলে শস্যক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িল, আর অচির মধ্যে তাহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। ইতস্তত সবাই আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছে।

সাহেব দেখিয়া তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ হাতজোড় করিল, কেহ বলিল, "হুজুর আমরা কিছু জানি নে।"

"মেমসাহেব কোথায় ?"

"আমরা জানি নে হুজুর।"

একজন বলিল, "মনসুর জানে।"

গোপাল বলিল, "মনসুর মেমসাহেবকে আটক রেখেছে।"

আবার সন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু না পাওয়া গেল মিস মাটিনডেলকে, না পাওয়া গেল মনসুরকে। সবাই ভাবিল তাহাদের আগমন আশঙ্কায় মিস মাটিনডেলকে লইয়া মনসুর গ্রামান্তরে পলাইয়াছে।

তখন সকলে হতাশ হইয়া ফিরিবে ফিরিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে একজন সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল, "এহি মেমসাহেব হ্যায়"

সকলে দেখিতে পাইল অদূরে ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে আবক্ষনিমগ্ন এক জন ইংরেজ তরুণী ছেঁড়া মেঘে প্রাতঃসূর্য্য-কিরণের মতো তাহার গাত্রের ছিন্নবস্ত্রের অবকাশে লাবণ্য ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার বিস্রস্ত স্বর্ণকুন্তলে দু'এক গাছি কচি শস্যকিশলয়, পাণ্ডুর তাহার কপোল, অধরে কচি অশোক পাতার বর্ণ, চক্ষু দু'টি ভীত বিস্মিত চঞ্চল। ঊষার অর্ধস্ফুট আলোকে ঈষদ্ভিন্ন ম্যাগনোলিয়ার কুঁড়ির মতো অস্ফুট সুন্দরী। ঘরের আলোতে অনেককেই সুন্দর দেখায়, আকাশের আলোতে কেবল যথার্থ সুন্দরীকেই সুন্দর মনে হয়।

লৌহবক্ষ সৈনিক তিনজন স্থানকালপাত্র ভুলিয়া বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রবিন আপনমনে বলিয়া উঠিল,

"Ruth, when sick for home,
She stood in tears amid the alien corn."

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিলে রবার্টস শুধাইল, "আশা করি তুমি মিস মাটিনডেল ?"

তরুণী বলিল, "তোমার কথা সত্য।"

"তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।"

"আশা করি তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত।"

"এখনি।"

এমন সময়ে ন্যাড়া গোপাল চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাহেব, ঐ যে মনসুরকে নিয়ে আসছে।"

সকলে দেখিল কয়েকজন সিপাহী একটি যুবককে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে।

মিস মাটিনডেল আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র মনসুর বুঝিয়াছিল যে, তাহার মেম সাহেবের স্বপ্ন এবারের মত শেষ, সে পালাইতেছিল। গ্রামবাসীরা সাহেবের করুণা পাইবে আশায় তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে।

মনসুরের সুন্দর, সুগঠিত, সবল দেহ বাঁধনের চাপে বিকল হইয়া বীভৎস দেখাইতেছিল। টানাটানিতে তাহার গায়ের কাপড় ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া গিয়াছে, পিঠের ফর্সা রঙের উপরে মোটা মোটা কালশিরা দেখা যাইতেছে অথচ তাহার মুখের কমনীয়তা এতটুকু কমে নাই, চিবুকের সুডৌল দৃঢ়তা তেমনি অটুট।

পুরুষের বীরবপুর এই বীভৎস অপমানে হঠাৎ মিস মাটিনডেলের অন্তরতম নারীপ্রকৃতি মোচড় খাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মানুষের গোপনতম সত্যতম যে পরিচয়, যেখানে পুরুষ আছে আর নারী আছে, পুরুষের দেহের বীভৎস ব্যঙ্গ নারীমনের সেখানে পৌঁছিয়া মিস মাটিনডেলকে একেবারে বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিল। সে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, "এ অন্যায়, অন্যায়!"

মনস্তাত্ত্বিক হইলে সে বুঝিতে পারিত তাহার মনরূপ মাস্তুলের চূড়ায় একখানা অতিরিক্ত অপ্রত্যাশিত পাল খাটানো হইল।

রবার্টস শুধাইল, "এই লোকটা তোমাকে কয়েদ করে রেখেছিল?"

"সিপাহীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল।"

"তারপর আটকে রেখেছিল?"

"কোম্পানীর ফৌজ কাছে ছিল না কাজেই।"

"এখন তো ফৌজ এসেছে, চলো।"

"না।"

"তার অর্থ ?"

"আমি এখানেই থাকব।"

তিনজনে চমকিয়া উঠিল, "তুমি কি বলছ ? আমাদের বিশ্বাস তোমার মাথার ঠিক নেই।"

"মাথা ঠিক আছে।"

"তবে খবর পাঠিয়েছিলে কেন ?"

সত্য কথা বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়, তত বলিবার শক্তি বা ইচ্ছা মিস মাটিনডেলের ছিল না। আর থাকিলেও কেন খবর পাঠাইয়াছিল, তারপরে কেনই বা হঠাৎ মতি পরিবর্তন করিল, সে-সব রহস্য সে জানিবে কি প্রকারে। শুধু বলিল, "একবার দেশের লোক দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল।"

"আর এখন এই বিদেশী লোকের মধ্যেই থাকবে স্থির করেছ ?"

"নিশ্চয়।"

"আশা করি, মতি পরিবর্তন হবে।"

"আশা করি, হবে না।"

"তোমার জন্য কি করতে পারি ?"

"ঐ লোকটার বাঁধন খুলে দিতে হুকুম করো।"

মনসুর বন্ধনমুক্ত হইল। তাহার বিস্ময় সকলের চাইতে অধিক। প্রথমে বিপদ, পরে বিস্ময়, দুই ধাক্কায় সে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল ; কথা বলিবার, ভাবিবার, কি হইতেছে সম্যক্‌রূপে বুঝিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছিল।

একজন ইংরাজ-রমণীর বিকৃত রুচি ও অধঃপাত দর্শনে ইংরাজ সৈনিকত্রয় ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের কিছু আর করিবারও ছিল না। তাহারা আর একবার মিস্ মাটিনডেলকে অনুরোধ করিয়া ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাহারা একটু দূরে যাইবামাত্র মনসুর মিস্ মাটিনডেলের কাছে গেল, অনুরোধের সুরে বলিল, "এবার ঘরে ফিরে চলো।"

মিস্ মার্টিনডেল মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "চুপ করো নির্বোধ।"

মনসুর ভাবিল, এ আবার কি বিপদ।

ন্যাড়া গোপাল স্থির করিয়াছিল, সে আর এ গ্রামে থাকিবে না, সাহেবদের সঙ্গে যাইবে। সে মনসুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ফিরিঙ্গি মেয়েদের মনের কথা বোঝে কোন্ শালা! যেমন ইড্রি মিড্রি ভাষা, তেমনি ইড্রি মিড্রি ভাব। ঠ্যালা বুঝবে ভাই মনসুর।"

মনসুর ইতিমধ্যেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সকলে গ্রামে ফিরিয়া গেল। কেবল মিস্ মার্টিনডেল সেই অর্ধপক্ক শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তেমনি আবক্ষ নিমগ্ন থাকিয়া দেখিল, তাহার স্বজাতি পুরুষত্রয় ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে, আর মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে বুঝিতে পারিত যে, মাস্তুল ক্রমে নূতন নূতন পাল তুলিয়া দিতেছে। অপরিচিত আকাশের অভাবিত হাওয়ায় এই তরুণ-তরুণী কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, কোন্ বন্দরে, কোন্ আঘাটায়, কোন অতলে।

নানাসাহেব

সিপাহী বিদ্রোহ মিটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো তাহার জের চলিতেছে। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে এখনো অনেকে ধরা পড়ে নাই, ভারতময় তাহাদের সন্ধান চলিতেছে, জের বলিতে ইহাই। দিল্লীর বাদশাহ নির্বাসিত, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্মুখ-সমরে নিহত, তাঁতিয়া টোপির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, ফৈজাবাদের মৌলবিও নিহত। নানাসাহেব ও তাহার দক্ষিণহস্ত আজিমুল্লা খাঁ এখনো ধরা পড়ে নাই। আরও একজন ধরা পড়ে নাই, সে বিখ্যাত নয়, কিন্তু বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান দায়িত্ব নাকি তাহারই, সে নানাসাহেবের হারেমের একজন ক্রীতদাসী, নাম জুবেদি বিবি।

নানাসাহেবকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দিকে দিকে প্রদেশে প্রদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রেরিত হইয়াছে, প্রচুর অর্থমূল্যও ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাকে পাওয়া যায় নাই। তবে পূরাদমে সন্ধান এখনো চলিতেছে, দক্ষিণে মাদ্রাজ, উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে আসাম আর পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশ চষিয়া ফেলা হইতেছে, নানাসাহেবকে ধরিতেই হইবে।

মাঝে মাঝে রব ওঠে নানাসাহেব ধরা পড়িল। ধৃত ব্যক্তিকে কানপুরে আনা হইলে পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিয়া দেখা যায় যে, সে নিরীহ সন্ন্যাসী বা ফকির মাত্র। নানা দেশ হইতে গুপ্তচরেরা আসিয়া বলে যে, নানাসাহেবকে দেখা গিয়াছে, কখনো মন্দিরে, কখনো মসজিদে, কখনো হাটে-বাজারে গঞ্জে গ্রামে বা কোন রেলষ্টেশনে। কিন্তু 'ঐ বাঘ, ঐ বাঘ' রব এতবার উঠিয়াছে যে ঐরূপ সংবাদে এখন আর কেহ বিচলিত হয় না। বস্তুতঃ এখন অনেকেই বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছে যে, নানাসাহেব মারা গিয়াছে। নানাসাহেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি

মত দাঁড়াইয়াছে। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা যে নানাসাহেব ১৮৬০ সালে নেপাল বা নেপালের তরাই অঞ্চলে মারা গিয়াছে। তাহারা বলে যে, ঐ সময়ে নানার যে সঙ্গিগণ নেপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মিথ্যা বলিবার কি হেতু থাকিতে পারে? এই সব সঙ্গীর মধ্যে নানার নাপিত অন্যতম। তাহাকে নানার মৃত্যু বিষয়ে প্রশ্ন করিলে এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইত:

—তুমি নানাকে কামাতে?

—কাকে কামাতাম?

—নানাকে?

—ওঃ সেই বাটপাড়কে। হাঁ বাটপাড়কে কামাতাম বটে!

—সপ্তাহে কবার?

—সপ্তাহে দুবার। বাটপাড়!

—এখন আর নিশ্চয় তার কামাবার দরকার নেই। সে নিশ্চয় মরেছে, কি বলো?

—মরেছে বলে মরেছে, একশবার মরেছে। খুব ভালো হ'য়েছে। বাটপাড়টা!

নানা মারা পড়িয়াছে কিনা তবু সংশয়ের রাজ্যে থাকিয়া যায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা যে মারা পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মানুষ এমনি বটে!

আর এক দলের লোক বলে নানা মরুক আর বাঁচিয়াই থাকুক তাহাতে এখন আর আশঙ্কার কিছুই নাই, সে পলাতক আসামী, দেশে তাহার আর প্রভাব নাই। অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এত প্রচুর খরচ করিবার আর প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দলটিই সংখ্যায় ও প্রভাবে প্রবল। তাহাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী। এই উপলক্ষে তাহারা প্রচুর বেহিসাবী টাকা ও রাহা-খরচ পায়, তাহাদের বিশ্বাসের অনুকূলে এ মস্ত একটা যুক্তি। তার উপরে আবার বিলাত হইতে একদল মোটা-বেতনের বিশেষজ্ঞ

আসিয়াছে, তাহাদের কেহ হাতের অক্ষরে বিশেষজ্ঞ, কেহ নাকের আকৃতিতে, কেহ চোখের দৃষ্টিতে, কেহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, কেহ বা পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ। এখন সরকার ভাবে, 'নানা মরিয়াছে' স্বীকার করিলে ইহাদের বিদায় করিয়া দিতে হয়, যে প্রচুর পুলিশ ও গুপ্তচর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের দল ভাঙিয়া দিতে হয়, সে এক হাঙ্গামা, হয় তো বা পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরে ভারত সরকারের অকর্মণ্যতা ঘোষিত হইবে; তাই সরকার নীরব, ভাবে 'অশুভস্য কাল হরণং', নানা মরুক আর বাঁচিয়া থাকুক তাহারা না মরিলেই যথেষ্ট।

ভারতের নানা স্থানে নানাকে ধরিবার জন্য বিশেষ ঘাঁটী বসিয়াছে, কোন লোক ধরা পড়িবামাত্র সে কানপুরে আনীত হয়; দেশময় যে শত শত নানাসাহেব ধৃত হইতেছে তাহাদের আসল নকল বিচার করিয়া মুক্তি দানের বা হাজতবাসের আজ্ঞা দানের একটি ক্লিয়ারিং হাউসে পরিণত হইয়াছে কানপুর সহর। এত সহর থাকিতে কানপুর সহর নির্বাচিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। কানপুরের কাছে বিঠুরে নানা দীর্ঘকাল ছিল, এ অঞ্চলের বহু লোকের কাছে নানা পরিচিত, তাছাড়া কানপুর সহরটা বিদ্রোহ-পীড়িত অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত, সেটাও একটা কারণ বটে।

কানপুর সহরের প্রকাণ্ড জেলখানা যেমন নানা শ্রেণীর নানাসাহেবে ভরিয়া গিয়াছে তেমনি মামুদের হোটেল নামে সৌখীন হোটেলটিও বিশেষজ্ঞ, উচ্চ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, কৌতূহলী ইংরাজ অতিথি-অভ্যাগতে পূর্ণ। হোটেলের মালিক মামুদ আলি হাসিখুশি মুখ, গোলগাল সুপুরুষ, নানাকে বেশ চিনিত, কেননা বিদ্রোহের সময়ে নানা কয়েক মাস এই হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিল।

কোন বিদেশী অতিথি যদি শুধাইত—নানা কি হোটেলের খানা খেত?

'বিসমিল্লা' বলিয়া মামুদ আলি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিত,—হোটেলের খানা! সর্বনাশ ও-কথা মুখেও আনবেন না, কে কোথায় শুনতে পাবে!

তবে খেতো কি?

এই ঘরটায় আসুন। এখানে নানার জন্য চুল্লি প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে হাঁড়ি চাপিয়ে হাঁড়ি মানে Earthen Pot……

ওঃ। তার প্রিয় খাদ্য কি ছিল?

ঘি, মানে Clarified butter; আর এই ঘরটায় একটা চারপায়া পেতে নানা শুতো।

ঘরে আর কোন আসবাব ছিল?

আসবাব? না। হাঁ, তবে একটা বাছুর ঘরময় অবাধে ঘুরে বেড়াতো, আর একটা চাকর সোনার বাটীতে ক'রে তার চোনা, মানে—

মানে শুনিয়া সাহেবেরা বলিয়া উঠিত, how horrible, তারপরে শুধাইত, সেটা কি করতো?

খেতো।

সাহেবগণ চমকিয়া উঠিত, ইংরাজী ভাষায় মনোভাব প্রকাশের যোগ্য শব্দ না পাইয়া তাহারা অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিত। কেহ কেহ আবার মনে মনে যুক্তিজাল বুনিয়া স্থির করিত উক্ত বস্তু যখন খায় তখন উক্ত বস্তুর আধারটিকেও অবশ্য খাইত। কোন কোন দুঃসাহসী ভাবিত একবার গোপনে উক্ত বস্তুটা চাখিয়া দেখিতে হইবে। নানা কি খামোকা খাইত, তাহার তো অভাব ছিল না, সে ভাবিত দেশে ফিরিয়া এ বিষয়ে একখানা বই লিখিয়া ফেলিবে, প্রকাশকের অভাব হইবে না, এখন নানাসাহেবের বাজার-দর চড়া।

নানার সম্বন্ধে সাহেবগণের মনোভাব যেমনি হোক, হোটেলের মালিক মামুদ সম্বন্ধে তাহাদের অনুকম্পার অন্ত ছিল না। সে প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী খানা জোগাইত, মদ জোগাইত 'অমুক জিনিষটা পাওয়া গেল না' এ কথা কেহ তাহার মুখে শোনে নাই, বিল আদায় করিতে, ফাইফরমাস খাটিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, আর তার সবচেয়ে বড় গুণ সে সময়মতো হাসিতে পারে। এ গুণটি যার আয়ত্ত, সংসারে সে সর্বজয়ী। সর্বজয়ী এই গুণটির বলেই বেতসীবৃত্তি

অবলম্বন করিয়া সে কোম্পানীর আমলে হোটেল চালাইয়াছে, নানার আমলে চালাইয়াছে এবং খাস মহারাণীর আমলে চালাইতেছে, কেহ কখনো তাহার সততায় সন্দেহ মাত্র প্রকাশ করে নাই। মামুদ হাসিয়া বলে, হোটেলওয়ালা, জল্লাদ ও টেবিল-খানসামা বা waiter-এর সম্বন্ধে বাছবিচার করলে চলে না।

হোটেলের হেড ওয়েটারটি সম্বন্ধে মামুদ সার্থক গর্ব্ব অনুভব করিত, বলিত, ঐ যে বিঠুরের ইঁদারার মধ্যে নানাসাহেবের একরাশ সোনার তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলোর বদলেও সে ইসাককে ছাড়িতে নারাজ। ইসাক তাহার প্রখ্যাত হেডওয়েটার। সে যে কোথা হইতে আসিল, কি তাহার পূর্ব্বেতিহাস কেহ জানিত না কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না, যাহারা জিজ্ঞাসা করিবার মালিক তাহারা সকলেই ইসাকের গুণে মুগ্ধ। মুখ খুলিবার আগেই সে মনের কথা বুঝিতে পারে, আবার এমন মনের কথা আছে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার আগেই ইসাক তাহা তামিল করিয়া বসে। দিন এবং রাত্রির যাবতীয় পরিচর্য্যায় ইসাক এমনি পারঙ্গত যে, সাহেব-বিবি অতিথি-অভ্যাগত দেশী-বিদেশী সকলেরই মুখে এক কথা, ইসাক, ইসাক। খানসামা-সুলভ চাপকানে ইসাক সজ্জিত, মাথায় টুপি, পা খালি এবং মুখে হোটেলের মালিকের মতোই সর্ব্বজয়ী হাসি। তবে মামুদের ও ইসাকের হাসিতে কিছু প্রভেদ ছিল। মামুদ সকলকে দেখিয়া সমান হাসি হাসিত, কিন্তু ইসাকের হাসিতে তারতম্য ছিল, লোকের পদ-মর্যাদা বিচার করিয়া সে হাসিত; কাহারো জন্য তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির মোহর, কাহারো জন্য হাসির টাকা, কাহারো জন্য বা হাসির আধুলি বা সিকি দুয়ানি, নিতান্ত হীনমর্যাদার জন্য পয়সা বা পাই, কেহই একেবারে বঞ্চিত হইত না।

মামুদের হাসি বলিত, তোমরা সকলেই আমার অতিথি, আমার চোখে তোমরা সবাই সমান, আর ইসাকের হাসি বলিত সকলকে সমান করিলে আমার চলে না, কে বেশি দামের খদ্দের, কে কম

দামের, কে জেনারেল, কে কর্ণেল, কে মেজর আমার জানা চাই; বস্তুতঃ মামুদের হাসি ও ইসাকের হাসি পরস্পর পরিপূরক।

আরও একটি কারণে সরকারী মহলে ইসাকের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সে নানাসাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিত, সে ছিল সরকারী সনাক্তকারী। এই যে নানাদেশ হইতে শত শত নানা আসিয়া জেলখানা ভরিয়া তুলিতেছে কে তাহাদের সনাক্ত করিবে? নানাকে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিত তাহারা হয় মরিয়াছে, নয় পালাইয়াছে, নয় অন্য কারণে সনাক্তকার্য্যে অসম্মত। এই সঙ্কটে ইসাক একমাত্র রক্ষাকর্তা। সে দীর্ঘকাল বিঠুরে ছিল, কানপুর সহরেও সে কতবার নানাকে দেখিয়াছে কাজেই সে-ই যোগ্যতম ব্যক্তি। খানা ও মদ রুচি মতো যে ব্যক্তি জোগান দিতে সক্ষম, সে বিশ্বাসভাজন না হইয়া যায় না, আর বিশ্বাসভাজনের সব কথাই সমান বিশ্বাসযোগ্য। সপ্তাহে একদিন করিয়া ইসাকের ডাক পড়িত জেলখানায় সনাক্ত-করণের প্যারেডে। সে গিয়া দেখিত এমন হাজার দুই নানা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান: বয়স বাইশ হইতে বিরাশি, মাথায় চার ফুট হইতে সাত ফুট, জাতিতে বাঙালী হইতে পাঠান—আর সবচেয়ে বেশি সাধু, সন্ন্যাসী পীর ফকিরের সংখ্যা। যে গেরুয়া এবং যে আলখাল্লায় জীবনের অনেক দুষ্কৃতি ঢাকা পড়ে, চিত্রগুপ্তের চোখে ধুলি দেওয়া যায়, সেই পোষাকই তো আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাই সম্ভবতঃই সাধু-সন্ন্যাসী আর পীর-ফকিরের সংখ্যাই কিছু অধিক। ইসাক সারিবদ্ধ নানাদের সন্মুখ দিয়া সবেগে চলিয়া যাইত, তারপরে অদূরে দণ্ডায়মান জেনারেল সাহেবের নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিত, হুজুর, তামাম ঝুটা।

সাহেব জেলারের প্রতি ইঙ্গিত করিত, বলিত, খালাস দো।

নানার দল ছুটি পাইত। কিন্তু জেলখানা কখনো খালি হইত না, কারণ বাল্যকালে যাহারা চৌবাচ্চার অঙ্ক কষিয়াছে তাহারা জানে এক নলে জল বাহির হইতেছে, আর এক নলে জল ঢুকিতেছে, ফলে

চৌবাচ্চা যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণই থাকিত। আর একদল নূতন নানা আসিয়া জেলখানা ভরিয়া তুলিত।

আর এক কারণে সাহেব-মহলে ইসাকের ডাক পড়িত। বিদেশী আসিয়া নানার কাহিনী শুনিতে চাহিলে ইসাক ছাড়া আর কে শুনাইবে? একদিনের কথা বলি। সেদিন দুইজন বিদেশী অতিথি আসিল, একজনের নাম মঁশিয়ে লুবলিন, সে ফরাসী; আর একজনের নাম মিষ্টার জর্জ, সে ইংরাজ। দু'জনেই দেশে থাকিতে পুস্তকে ও পত্রিকায় নানার কাহিনী পড়িয়াছে।

ড্রয়িংরুমে বসিয়া লুবলিন ও জর্জে নানার বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, অদূরে বিনীতভাবে ইসাক দণ্ডায়মান। সে একবার মঁশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসে, আর একবার মিষ্টারের দিকে তাকাইয়া হাসে, মিষ্টারের প্রতি প্রযুক্ত হাসিটি প্রশস্ততর, কারণ যদিচ হোটেলের অতিথি হিসাবে দুজনেই সমান আদরণীয়, তবু মিষ্টার যে রাজবংশীয়, তাহার রাজপ্রাপ্য তো মঁশিয়ের সমান হইতে পারে না!

মঁশিয়ে বলিতেছে, মিষ্টার, নানা সম্বন্ধে আমার ধারণা কি জানেন? কাশ্মীরী ঢিলা পোষাক গায়ে, পার্শিয়ান চটি পায়ে গদির উপরে গড়াচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন খাপ-সুরৎ মেয়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখা দুলিয়ে বাতাস করছে, আর বালজাকের Droll Stories পড়বার ফাঁকে ফাঁকে পায়ের কাছে অর্ধশায়িত অর্ধনগ্ন ইরাণী মেয়ে দুটোকে মাঝে মাঝে সে চিমটি কাটছে। এমন সময়ে একজন সিপাহী সঙীনের ডগায় বিঁধিয়ে নিয়ে এলো একটা ইংরাজ শিশুকে, সেটাকে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর কোলের মধ্যে থেকে একটা মিশরীয় বেড়াল লাফিয়ে পড়ল, ছেলেটাকে ভালো করে দেখবার জন্যে সে নাক-টেপা চশমাটা পরে নিল, তাড়াতাড়ি উঠবার সময়ে সেটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মঁশিয়ে ইসাকের দিকে তাকালো, ইসাক মাথা ঈষৎ নত করে একবার হাসলো।

কিন্তু জর্জের সে রকম মনোভাব নয়। সে বলল, মঁশিয়ে, নরকের সেই কীট-টা সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। কি রকম বলবো!—Guy Fawke's Dayতে Guy Fawkes-এর যে মূর্তিটা আমরা আমরা দাহ ক'রে থাকি অনেকটা তারই মতো Nana-র (মিষ্টার কৃত উচ্চারণ ন্যান্যা) চেহারা, তবে আরও ভীষণ কেননা, প্রাচ্যদেশের চেহারা স্বভাবতঃই কুৎসিত। তার মাথাটা প্রকাণ্ড একটা হাঁড়ির মতন, লেখাপড়া কিছুই জানে না, কোন অনুচরের উপরে রেগে গেলে তখনই পদাঘাতে তাকে নিকেশ করে ফেলে, আর তার প্রিয় খাদ্য শিশুদের লিভার। আর রোজ রাত্রিবেলা সে কুমারী মেয়ের হৃৎপিণ্ডের চাটনি খায় স্বাভাবিক শক্তি অর্জনের আশায়! Oh, a veritable monster!

মিষ্টার ইসাকের দিকে তাকাইবামাত্র ইসাক মাথা আরও একটু নত করিয়া প্রশস্ততর একটি হাসি হাসিল।

কিন্তু মিষ্টার মঁশিয়ে নয়, হাসির প্রকৃত মূল্য না দিয়াই সে বলিয়া উঠিল, a peg!

মিষ্টার নিজের বর্ণনার চাপে নিজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দুটি পেগ মিষ্টার ও মঁশিয়ের যথা স্থানে গমন করিলে মঁশিয়ে বলিল—ইসাক, তুমি তো জানতে নানাকে, বল তো সে কেমন ছিল!

ইশাক দুজনের দিকে তাকাইয়া দুবার হাসিয়া লইয়া আরম্ভ করিল, সাহেব, আপনাদের কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তব পারবে কেন? যে সব গুণের আপনারা উল্লেখ করলেন হতভাগ্য নানার সে-সব কিছুই ছিল না। সে নিতান্ত সাদামাঠা লোক, বেঁচে থাকলে বয়স এতদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝে হত, রঙ কালো, কারণ যে সব লোক ইউরোপের বাইরে জন্মেছে আপনাদের চোখে তারা সবাই কালো, মোটাসোটা দোহারা চেহারা। খেতো চাপাটি আর ডাল, তা-ও আবার অনেক সময় স্বহস্তে তৈরী করে। তার হারেমে অবশ্য অনেক স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু সেটা তাদের অন্যত্র যাবার ইচ্ছার অভাবে। ফরাসী ভাষা দূরে থাক, ইংরাজি ভাষাও জানতো না বললেই হয়।

আর নাকটেপা চশমা! তার এজেণ্ট আজিমুল্লা খাঁর একজোড়া কানে পরানো চশমা ছিল বটে!

এই বলিয়া সে মিষ্টার ও মঁশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিল, ভাবটা এমন যে, আপনাদের বর্ণনাই ঠিক।

মঁশিয়ে বলিল, হাউ ট্রুথফুল অর্থাৎ, তোমার বর্ণনা শুনে মনে হয়, সে ছিল তোমার মতোই দেখতে।

মিষ্টার বলিল, All orientals are liars অর্থাৎ নিশ্চয় সত্য গোপন করবার চেষ্টা করছ।

ইসাক দুজনের কথাতেই এমনভাবে হাসিল, যেন বলিল, আপনারা দুজনেই সমান সত্য কথা বলিয়াছেন।

এমন অপরিসীম ধৈর্য্য, কৌশল, মানব-চরিত্রজ্ঞান ও বুদ্ধি ইসাকের মামুদের কথাই ঠিক, তুচ্ছ সোনার দামে ইসাকের দাম! সত্যই ইসাকের তুলনা হয় না।

২

১৮৬১ সালে উত্তর ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাহার একটি বাস্তব ফল হইল যে, নানাসাহেবের সংখ্যা অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। আগে আসামী খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত, এখন আসামী সরকারী লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া ধরা দেয়। আগে সাধু ফকিরের সংখ্যাই বেশী ছিল, এখন গৃহীর সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিল। গৃহীর খাদ্যাভাব, সাধু ফকিরের ভিক্ষার অভাব। সকলেই জানে যে হাজতে রাখিলে খাইতে দেয়, আরও শুনিয়াছে যে, একবার আসামী বলিয়া সনাক্ত হইতে পারিলে পুলিপোলাও চালান হইবে তখন আর খাওয়া পরার চিন্তা করিতে হইবে না। সকলেই ভাবে, আহা এমন সৌভাগ্য কি হইবে, যে পোড়া কপাল!

একদিন সকালে সীতাপুর থানায় জনকয়েক নানা আসিয়া উপস্থিত

হইল, হাঁকিল, কইগো দারোগা সাহেব, আমাকে গ্রেপ্তার করো, আমি নানা সাহেব। দারোগা আসিয়া দেখিল অনেকগুলি উমেদার। সে বলিল, এক সঙ্গে এতজন তো নানা হতে পারে না।

নইলে নানা বলেছে কেন? একজন হ'লে তো একখানা বলিত।

দারোগা খোঁজ করিয়া জানিল যে, লোকটি পাঠশালার পণ্ডিত। বলিল, নইলে আর অমন বুদ্ধি হয়!

তোমার অত বিচারের কাজ কি! তুমি সকলকে চালান দাও, যার ভাগ্যে আছে নানা সাহেব হবে।

দারোগা বিরক্ত হইয়া বলিল, গ্রেপ্তার করতে নিষেধ আছে।

পাঠশালার পণ্ডিত বলিল, ও বুঝেছি, কেউ বুঝি দু'পয়সা খাইয়েছে।

দেখো ও-সব কথা বললে আইনে পড়বে।

আরে সেই ভরসাতেই তো বলছি। যে কোন একটা ধারায় গ্রেপ্তার করো।

দারোগা কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিশুদ্ধ দেবভাষায় বলিল, অয়ম্ অহম্ ভো—অর্থাৎ আমি নানাসাহেব, গ্রেপ্তার করো।

দারোগা বলিল, তুমি তো সন্ন্যাসী।

বটে? সন্ন্যাসীর কি এমন হাতের গুলি হয়?

এই বলিয়া বাহুর গুলি পাকাইয়া দারোগার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, বলিল, টিপিয়া দেখো, হাতের গুলি, না লোহার গুলি।

দারোগা বলিল—আমি কি করবো ঠাকুর এরাও যে উমেদার, এই বলিয়া গৃহীদের দেখাইয়া দিল।

তখন 'তবে রে শালে বুরবক' বলিয়া সেই বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী লাঠি তুলিয়া গৃহীদের তাড়া করিল, তাহারা সামান্য গৃহী মাত্র, প্রাণের দায়ে নানাসাহেব পদের উমেদার হইলেও প্রাণের মায়া এখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা পলাইল।

তখন সন্ন্যাসীর অনুকূলে নানাসাহেবের পদ সাব্যস্ত হইয়া গেল। থানার বারান্দায় সে দিব্য জমাইয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে দারোগাকে আদেশ করিল, এ বেটা আভি নানাসাহেবকো খিলাও।

উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেক পুলিশথানাতেই প্রত্যহ এমন দৃশ্যের অভিনয় হইত। আর এই সব নানার ধারা যে মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইত সেই কানপুর সহরের দৃশ্য উপভোগ করা সহজ হইলেও বর্ণনা করা সহজ নয়। জেলখানার নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতটি বড় বড় বাড়ী ভর্তি হইয়া গিয়া এখন খোলা মাঠে তারের বেড়া খাটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া নানার দল জেনারেল সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছে—ও খরচাটা নাই করিলেন, আমরা পলাইবার জন্য আসি নাই। তাহারা আরও বলিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহারা মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশবা, কাজেই আহারাদির সেই অনুপাতে ব্যবস্থা করা বৃটীশ রাজ্যের পক্ষে উচিত হইবে, পেশবা এখন গদিচ্যুত হইলেও এক সময়ে রাজা তো ছিল বটে।

জেনারেল সাহেব জেলারকে ডাকিয়া শুধাইল, হঠাৎ নানার সংখ্যা বেড়ে উঠবার হেতু কি ?

জেলার বলিল, এতদিনে সরকারী মেশিন বেশ চালু হয়েছে কিনা ?

জেনারেল সাহেব বলিল,—হুম্। জেলারের খাস মুন্সী মুখুজ্জে বলিল, সাহেব, খানা বন্ধ করে দিন, নানার দল পালাবে।

জেলার বলিল, তা কেমন করে হয় ? সনাক্তকরণ না হলে কাউকে ছাড়তে পারি নে।

পরিবর্তিত অবস্থায় এখন সপ্তাহে তিনদিন সনাক্তকরণ হয়, ইসাকের কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ভোরবেলা সনাক্তকরণ আরম্ভ হইয়াছে। জেনারেল সিভিল সার্জ্জেণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপার ও বিশেষজ্ঞগণ হাজির আছে। জেলার ও ইসাক সনাক্তকরণে অগ্রসর হইয়াছে।

ইসাক একটা লোকের কাছে একটু থামিতেই তাহার মুখ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, আমিই, মিঞা সাহেব, আমি।

তুমি কি বিবিদের হত্যা করেছিলে?

নিশ্চয়ই; এখন চালান না দিলে অতঃপর বাবাদেরও সাবাড় করবো।

না! তুমি নও।

তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইল জানিবামাত্র লোকটি বুক চাপড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—মহারাণীর দোহাই লাগে জেলার সাহেব আমি সেই বাংলা মুল্লুক থেকে আসছি। মামলায় আর বন্যায় আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। রেলগাড়ীতে টিকিট কিনবার পয়সা অবধি ছিল না, নানা বলতেই চেকারবাবু ছেড়ে দিলে। বড় ভরসা করে এসেছি সাহেব, এখন তোমরা ঠেললে দাঁড়াই কোথায়?

পাশেই জনকতক বরখাস্ত বাঙালী উমেদার ছিল। তাহারা বলিল, কান্নাকাটির যুগ নয় ভাই, সঙ্গে সঙ্গে গণবিক্ষোভ করি, অমনি ঢোলের সঙ্গে কাঁসীর মতো তু' চারজনের প্রায়োপবেশন করাও সঙ্গত হবে।

একজন বলিল, আহা, আর কাঁসীর সঙ্গে শানাইয়ের মতো একখানা সংবাদপত্র থাকলে আজ কি তুশো মজাই না হতো।

অপর একজন বলিল, দেখতাম কেমন ওরা বাংলাদেশের দাবী অগ্রাহ্য করে। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া 'বাংলার দাবী মানতে হবে, অবাঙালী নানা চলবে না', প্রভৃতি আওয়াজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে সনাক্তকরণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, যাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইতেছে তাহারা নীরবে বিষণ্ণভাবে চলিয়া যাইতেছে, বাঙালী নয় বলিয়া গণবিক্ষোভ বাধাইতেছে না।

এমন সময়ে এক জায়গায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ইসাক অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, একজন মুসলমান ফকির ও একজন হিন্দু সন্ন্যাসীতে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। ফকির বলিতেছে যে, সে নানাসাহেব আর হিন্দু বলিতেছে যে, সে নানাসাহেব। আর উভয়পক্ষে

কিল, ঘুষি চলিতেছে। ভাগ্যে তখন সমাজচৈতন্য এখনকার মতো প্রবল হইয়া ওঠে নাই নতুবা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া যাইত।

ইসাক বলিল, বাপু তোমরা কেহই তো নানাসাহেব নও।

বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ? দেখতে পাও না?

আমি নানাসাহেব নই বলে কি তোমার বাপ নানাসাহেব?

ইসাক বিরক্ত হইয়া বলিল, স্বীকার করছি বাপ্ আমিই নানা-সাহেব। এবার হ'ল তো?

চাঁদ আর কি! নানাসাহেব তো হয়ে এসেছ সনাক্ত করতে।

সে বিষয়ে নানাসাহেবই তো সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

জেলার সাহেব কাছেই ছিল। সে "ডেশী বাষা উট্টমরূপে শিক্সা" করিয়াছে; ইসাকের Wit দেখিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, বহুৎ আচ্ছা।

তবে রে বেটা অলপ্পেয়ে। দাবীদার দুইজনেও ইসাকের পিঠ চাপড়াইতে অগ্রসর হইল, তবে তাহার রকমটা ভিন্ন।

তাহারা দুইজনে একসঙ্গে ইসাককে আক্রমণ করিল।

বল্ আমি নানাসাহেব। দেশে ভাত ভিক্ষে মেলে না আবার বলে কিনা নানাসাহেব নই। অপরে বলিল, আমার চোদ্দপুরুষ নানাসাহেব।

ইসাক প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিল। সেদিনের মতো সনাক্তকরণ প্যারেড শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ইসাক জেনারেল সাহেবকে বলিল, হুজুর আমাকে এবার ছুটি দিন। এমন করে মার খেতে আর পারি নে।

বলো কি ইসাক! তুমি না থাকলে নানাকে ধরবো কি করে? দেখছ তো সরকার কত খরচ করছে। না, না, তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেওয়া চলবে না, তারচেয়ে তোমার সঙ্গে দু'জন পাঠান বডিগার্ড দেবো।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে একজন ভদ্রলোক ও একজন স্ত্রীলোক মামুদের হোটেলে ঢুকিয়া ডাইনিং কক্ষে গিয়া বসিল। ভদ্রলোকটির পরনে সাহেবী পোষাক, আর স্ত্রীলোকটির

পরনে মেম সাহেবের পোষাক। গায়ের রঙ দেখিলে তাহাদের পুরা ইংরাজ মনে হয় না, হয়তো বা ইউরোপীয়ান হইবে।

ভদ্রলোক বলিল, তোমার পরামর্শে এলাম, এখন বিপদে না পড়ি। স্ত্রীলোকটি বলিল, ইসাকের চোখে পরীক্ষা না হলে বুঝবো কেমন করে? এ বিষয়ে ঐ লোকটাই তো বিশেষজ্ঞ। দেখো না সরকার ওকে কত যত্ন করে পুষছে।

যদি ধরে ফেলে?

পাগল নাকি। আমি বলছি ধরতে পারবে না। মেয়েদের অশিক্ষিতপটুত্বের খ্যাতি শোন নি কি? তাছাড়া বিপদের ভয় তো আমারও আছে।

আচ্ছা তাহলে ওকে ডাকি।

পুরুষটির আহ্বানে ইসাক আসিলে দুজনের মতো খাবার আনিতে হুকুম করা হইল।

ইসাক সেলাম করিয়া খাবার আনিতে গেল।

দেখলে তো ধরতে পারে নি।

তাইতো মনে হচ্ছে।

ইসাক খাবার আনিল। দু'জনে হৃষ্ট মনে খাইল। তারপরে দাম চুকাইয়া দিয়া ইসাককে কিছু বখশিশ দিল পুরুষটি।

ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম আজিমুল্লা খাঁ।

বলে কি! শুনিবামাত্র পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির মুখ শুকাইয়া গেল।

পুরুষটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও স্ত্রীলোকটি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বলিল, যাও দু'পেগ মদ নিয়ে এসো।

সে চলিয়া যাইবামাত্র পুরুষটি বলিল, বলেছিলাম ধরে ফেলবে। চলো এখুনি পালাই।

স্ত্রীলোকটি বলিল, লোকটা সারাদিন ঐসব নাম ভাবছে, তাই ভুলে বলে ফেলেছে। দেখব এর পরে হয়তো নানাসাহেব বলেই সেলাম করে ফেলবে। তাছাড়া পালাবেই বা কোথায়? হোটেলের বাইরেও তো ইংরাজের রাজত্ব।

এমন সময়ে ইসাক দু'পেগ মদ লইয়া আসিল।

দু'জনে পান করিল। এবারে মেয়েটি দাম চুকাইয়া দিয়া বখশিশ দিল।

ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম জুবেদি বিবি।

নাঃ, আর সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। ইসাক দু'জনকেই চিনিয়া ফেলিয়াছে। ভয়ে তাহাদের মুখ পাংশু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারিল না।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ইসাক মুখে সেই সর্বজয়ী হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আজিমুল্লা খাঁ, জুবেদি বিবি, আপনারা ভয় পাবেন না। সব চেয়ে নিরাপদ স্থানে এসেছেন, এখানে নির্ভয়ে থাকুন, কেউ আপনাদের চিনতে পারবে না।

মেয়েটি বলিল, তুমি চিনলে কি করে?

ইসাক বলিল, আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি আপনার কাজ? আমি যে নানাসাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

পুরুষ ও রমণী যুগপৎ শুধাইল, কিন্তু তুমি কে?

এবারে ইসাক তাহাদের কাছে আসিয়া, কণ্ঠের স্বর অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমিই নানাসাহেব।

প্রায়শ্চিত্ত

নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে ভারত সীমান্তের কাছে প্রাচীন শাল ও সেগুন গাছের ছায়ায় ধানগড় একখানি মাঝারি গোছের গ্রাম। আগে গ্রামটি হৃতদরিদ্র লোকের বাসভূমি ছিল, কিন্তু কয়েক বছর হইল 'রাণীমা' আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন, তাঁহার বদান্যতায় গ্রামটি এখন বর্দ্ধিষ্ণু। ধানগড় গ্রামের পূবদিকে ছোট একটি নদী, এ দেশের সব নদীই গঙ্গা, নদীটির নাম দুধগঙ্গা। নদীর ধারে গ্রামের দিকে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। লোকে বলে অর্জ্জুন এখানে মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শিবরাত্রির সময়ে এখানে মেলা বসে, এখন বসিয়াছে। যাহারা পশুপতিনাথের মেলা পর্য্যন্ত যাইতে পারে না এখানে দর্শন ও পূজা করিতে আসে; এখন আসিয়াছে। শিবমন্দির হইতে এক সারি সোপান নদীর মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, জল পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই, গ্রীষ্মকালে জল এখন অনেক নীচে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

নদীর পরপারে শালগাছের ছায়ায় বড় একখানি পাথরের উপরে একজন লোক আসীন। তাহার গৈরিক বসন, মাথার জটাভার, কমণ্ডলু ও সুদীর্ঘ লৌহ-ত্রিশূল প্রমাণ করে যে লোকটি সন্ন্যাসী এবং সম্প্রদায়ে শৈব। সন্ন্যাসী সুপুরুষ নয় কিন্তু তাহার মুখে চোখে ব্যবহারে এমন কিছু আছে যাহাতে লোকনায়ক বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী ওপারের শিবমন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণে মেলার ছাউনি প্রভৃতি দেখিতে ছিল সত্য কিন্তু তাহার চোখে এমন একটা ঔৎসুক্য ও প্রতীক্ষাপরতা ছিল যাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে সে কাহারো অপেক্ষা করিতেছে, অনেকক্ষণ হইল অপেক্ষা করিতেছে মনে

হয়, কারণ তাহার মুখে আশাভঙ্গের ছায়া পড়িয়াছে। এখন সে অন্যমনস্কভাবে অভ্যাসবশে চাহিয়া আছে, মনোযোগের প্রধান ধারা অন্তর্মুখে বহিতেছে। সন্ন্যাসী প্রাচীন সংস্কৃতি রোমন্থন করিতেছিল।

আপনাকে আমি আশ্রয় দিতে পারি এমন সাধ্য নেই, আমি কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রীতে বদ্ধ।

আমি নিজের জন্য আশ্রয়প্রার্থী নই রানা সাহেব, কিন্তু আমার পত্নী পিতামহী এঁদের নিয়ে কোথায় যাবো?

সে কি কথা, এঁরা স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন না। এই গ্রামেই এঁরা বাস করবেন, আাম মাসোহারা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেবো।

অসংখ্য ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ! পেশবাপত্নী আমার রাজ্যে অতিথি, ধন্যবাদ তো আমার দেওয়া উচিত। কিন্তু আপনি?

যার নাই অন্য গতি, তার আছে বারাণসী।

কি সর্ব্বনাশ, আপনি কি কাশীতে যাবেন?

না সে রকম দুঃসাহসী আমি নই। ভক্তের হৃদয়েই তো বারাণসী, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করবো।

তারপরে?

তারপরে পশুপতিনাথের রাজত্বে পাহাড় পর্ব্বত গুহা অরণ্য তো অল্প নয়, সন্ন্যাসীর জায়গা হবে। তাতে বোধ করি আপনার আপত্তি নেই রানা সাহেব!

এই পর্ব্বতের মধ্যে কে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার সরকার তার কি সন্ধান রাখে নানাসাহেব।

তা হলেই চলবে।

ছয় বছর আগেকার প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি দৃশ্য, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সন্ন্যাসীর মনে পড়িল, এখানে আসিলে মনে পড়ে, মনে পড়িলে মন বিকল হইয়া যায়, মন বিকল হইলে অতীতের গৌরব, ভবিষ্যতের সঙ্কল্প সমস্ত মিথ্যা মনে হয়। তবে ভরসার মধ্যে এই যে

বছরে একদিনের বেশী প্রাচীন কথা মনে পড়িবার পথ বন্ধ, বছরে একদিনমাত্র, শিবরাত্রির দিনটি সন্ন্যাসী এখানে আসেন। রানা সাহেব সেই অনুমতিটুকু দিয়াছেন। রানা বলিয়াছেন কোম্পানীর চর চারিদিকে ঘুরিতেছে, ভারত সীমান্তের এত নিকটে ঘন ঘন আসা নিরাপদ নয়। তবে শিবরাত্রির সময়ে বিপদ কম। ঐশ্বর্য্যের ঐরাবতে আসীন বিঠুরের নানাসাহেবকে হাজার হাজার সন্ন্যাসীর মধ্যে সন্ন্যাসীর বেশে সনাক্ত করা সহজ নয়।

আজ ছয় বছরে ছয়বার মাত্র নানা এখানে আসিয়াছে, ছয়বার মাত্র পত্নীকে দেখিয়াছে। সেদিন যাহার বয়স ছিল চোদ্দ, আজ সে বিংশতিবর্ষীয়া। নানার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

রানা সাহেব, এই হচ্ছে পেশবাদের প্রসিদ্ধ নৌলখা হার, আপনাকে বিক্রয় করতে চাই। থালার উপরে বিন্যস্ত নববর্ষাসমুৎফুল্ল শিখীর বিস্ফারিত কলাপের মতো চিত্রবর্ণ রত্নহার দেখিয়া রানার ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি লোভে ঈর্ষ্যায় বিস্ময়ে জ্বলিয়া ওঠে।

সত্যই অপূর্ব্ব। কিন্তু এখন রাজকোষে অর্থাভাব, কোম্পানীর জন্য ফৌজ পাঠাতে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে। এক লাখের বেশী দেওয়ার উপায় নেই।

নানা বুঝিল ঐতেই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক, নতুবা কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ, রাণার চোখে লোভের ঝলক সে দেখিয়াছে।

এবারে নানাপত্নী কথা বলিল, রানা সাহেব, নগদ বেশি না দিতে পারেন, খান দুই গ্রাম আমাকে ইজারা দিন।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ গ্রামের নাম ধানগড়, পাশের গ্রাম রাহারিয়া আপনাকে জীবনসত্ত্ব দিলাম, ছয় হাজার টাকা মুনাফা হবে।

নানা পত্নীর বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইল। এক মুহূর্ত্ত আগে যাহা জলে পড়িয়াছিল তাহার এমন নিপুণ উদ্ধার! তাহার গৌরব বোধ হইল যে কাশীবাঈ পেশবা সিংহাসনের যথার্থ সহধর্মিণী। কিন্তু তখনি আবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল—মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী আজ বিদেশে দু'খানি গ্রামের ইজারাদার।

নানা সন্ন্যাসী বেশে বিদায় হইয়া গেলে কাশীবাঈ ধানগড়ে স্থায়ী হইয়া বসিলেন। তিনিই এখানকার রাণী মা। তিনিই সমারোহ করিয়া শিবরাত্রির মেলা বসান। সারা বছর তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন কবে শিবরাত্রি আসিবে, কবে সেই সঙ্গে নানা আসিবেন।

অতীত হইতে নানার মন বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিল, মনে পড়িল কখনো তাহাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। এবারে এত বিলম্ব কেন? কোন বিপদ ঘটে নাই তো? কাশীবাঈ সুস্থ আছে তো? ক্লান্ত মজ্জমান ব্যক্তি অনেক চেষ্টায় একবার ভাসিয়া উঠিয়াই আবার যেমন তলাইয়া যায় নানার মন আবার অতীতে ডুবিয়া গেল। নানা এখন অতীতজীবী। এবারে কতক্ষণ সম্বিৎহীন ছিল জানি না, হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল পায়ের উপরে একটি ছায়া পড়িয়াছে।

কাশীবাঈ—নানা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। অন্য বারের মতো কাশীবাঈ আলিঙ্গনে ধরা দিল না, সরিয়া গেল।

বিস্মিত নানা এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল, ডাকিল, কাকুবাঈ, মুখ মলিন কেন?

কাকুবাঈ তাহার আদরের নাম।

তবুও সে নীরব।

কোন বিপদ ঘটেছে?

এবারে সে কথা বলিল, বলিল, না দুঃখ কিসের, সুখেই আছি।

তবে—

তবে এত সুখ বুঝি আমার অদৃষ্টে নাই।

আমার আগমনে—

তোমার আগমনেই বেশি ক'রে মনে পড়ছে এত সুখে আমার অধিকার নেই। নানা অভিমানে বলিল, তবে না হয় আমি আর আসবো না।

তোমার জন্যই সারা বছর পথ চেয়ে—

পত্নীর কথা শেষ হইবার আগে নানা শুরু করিল—সারা বছর পাহাড়ে পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে ঘুড়ে বেড়াই, মন তোমার কাছে প'ড়ে থাকে। ইচ্ছে হয় আরো ঘন ঘন আসি কিন্তু সাহস হয় না, কোম্পানী আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

কেন ?

বিস্মিত নানা বলিল, কেন, তা কি জানো না ?

এতদিনে পরে জেনেছি।

বিদ্রোহের অপরাধে।

না। বিবিঘরে হত্যাকাণ্ডের অপরাধে।

নানা চমকিয়া উঠিল। সেই ব্যাপারটি সে সম্পূর্ণভাবে পত্নীর কাছে চাপিয়া গিয়াছিল, বলিল—তোমার কাছে এ সংবাদ এলো কি ক'রে ?

পাপের সংবাদ কাকের মুখে আসে, বাতাসে ভেসে আসে।

পাপ ? শত্রুকে হত্যা কি পাপ ?

অসহায় বালকবালিকা আর স্ত্রীলোকেরা তোমার শত্রু !

শত্রুর স্বজনগণও যে শত্রু। তাছাড়া কোম্পানী কি অসহায় নর-নারীকে হত্যা করে নি ?

এক পাপের দ্বারা আর এক পাপের প্রতিকার হয় না। আর পাপ যদি না হবে তবে আমার কাছে চেপে গেল কেন ? লড়াইয়ের সব কথাই তো বলতে।

খুন খারাবির সব কথা কি সুন্দর বাঈকে বলবার যোগ্য ?

সুন্দর বাঈ তাহার আর একটি আদরের নাম।

তা নয়। তুমি জানতে যে ঐ কাণ্ডটা জঘন্যতম পাপ তাই আমার কাছে চেপে গিয়েছিলে।

নানা হাড়ে হাড়ে জানিত যে তাহার কথা অতিশয় সত্য। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের আগে সে প্রিয়তমা পত্নীকে বিঠুর হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল। তাহার কানে এই সংবাদ গেলে সে দুঃখ পাইবে।

এই ছিল নানার ভয়। তার চেয়েও বেশি ভয় ছিল নানার বীভৎস সঙ্কল্প পূর্বাহ্ণে জানিতে পারিলে সে নানাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবে। তাহার অনুরোধ এড়ানো কঠিন—নানা সত্যই তাহাকে ভালোবাসিত, ভালোবাসা বলিতে মানুষে যাহা বোঝে সেই ভাবটি নানা একমাত্র তাহার প্রতি অনুভব করিত। নানার কৌশলে এতদিন কথাটি পত্নীর কানে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহার কাছে যে-সব পরিচর ছিল তাহারা সকলে নানার বিশ্বাসভাজন, সে বিশ্বাস তাহারা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এতদিন পরে, এতদূরে কে এই খবর দিল তাহার পত্নীকে? নানা বিস্মিত হইল, বলিল—এতদিন পরে সেজন্য অনুশোচনা করে কি ফল?

তোমার কাছে এতদিন পরে—আমার কাছে আজ নূতন।

পুরাতন কথা ছেড়ে দাও।

পাপ কি পুরাতন হয়?

হয় না?

তবে পুরাতন হলে তার ভার আরও বাড়ে।

সে পাপের ভার আমার।

অর্ধেক আমার নয়? কিন্তু তুমি যে বাকি অর্ধেকের ভারেই ডুববে?

ডুবতে আর বাকি কি?

সে তো ঘটনাচক্রে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

বেশ, আমি করবো।

তোমার কথা তুমি জানো, আমার অর্ধেকের প্রায়শ্চিত্ত আমি ছাড়া আর কে করবে?

রাজার পাপের দায়িত্ব তুমি কেন নেবে?

আমি রাণী নই?

স্বভাবতঃ চাপা, প্রেমে অচপল, দুর্ভাগ্যে নীরব কাশীবাঈয়ের মুখরতায় নানা অদৃষ্টের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করিল, হতবুদ্ধি হইয়া সে একখানা পাথরের উপরে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সে সতেজে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, সগর্বে আদেশের স্বরে বলিল, বলো কে তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছে? কাকের মুখ, বকের মুখ, বাতাসে ভেসে আসা ও সবে বিশ্বাস করি নে।

এবারে সন্ন্যাসীর বেশ ভেদ করিয়া তাহার রাজসিক ব্যক্তিত্ব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে কেবলি পাথরে সুদীর্ঘ ত্রিশূলখানা ঠুকিতে লাগিল, বলো, কে বলেছে।

কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া কাশীবাঈ বলিল, খবর সত্য কিনা বলো, কে খবর দিয়েছে শুনে কি ফল?

তবু শুনতে চাই।

আমি বল্‌তে প্রস্তুত নই।

এত সাহস?

ভয় কিসের?

আমি কত নারী হত্যা করেছি শুনেছ তো।

না হয় আর একটা বেশী করবে।

সংবাদদাতা তবে নারী?

বিচলিত কাশীবাঈ বলিল, আমি নিজের কথা ভাবছি।

এবারে নানার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইল, বলিল, তোমাকে হত্যা করবো কাকু?

নইলে হয়তো যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

নানা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, আবার বসিল, এবং দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া বাষ্পকরুণ কণ্ঠে মূঢ়ের মতো বলিতে লাগিল, তোমাকে হত্যা করবো, তোমাকে হত্যা করবো! কাকুবাঈ, তুমি এমন নিদারুণ কথা ভাবতে পারলে!

স্বামীর বৈকল্য দর্শনে কাশীবাই-এর হৃদয় গলিল, কাছে আসিয়া গায়ে হাত রাখিয়া বলিল, চলো, ওপারে চলো, পরিশ্রান্ত হয়েছ, বিশ্রাম করবে, এদিকে সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এলো।

না, এখন আমি কিছুক্ষণ এখানে ব'সে বিশ্রাম করবো।

তাই ভালো। তোমার ওপারে গিয়ে কাজ নেই। গাঁয়ে ক'জন অপরিচিত লোক এসেছে, সবাই বলছিল কোম্পানীর চর হ'তে পারে। পূজো হ'বা মাত্র আমি তোমার জন্য প্রসাদ নিয়ে আসবো। এখন চল্লাম।

নানা আপত্তি করিল না দেখিয়া কাশীবাঈ দ্রুতপদে নদীপার হইয়া গৃহে চলিয়া গেল।

২

প্রাচীন বনস্পতি সমূহের তলদেশে সরীসৃপ গাত্রের মতো শীতল-স্পর্শ সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে একাকী বসিয়া নানার মন আর একবার অতীতে ফিরিয়া গেল। তাহার সন্ন্যাস জীবনে অতীতের কথা কখনো কখনো মনে পড়িত, কিন্তু সে যেন উপত্যকার ফাঁকে দূরের আকাশ চোখে পড়ার মতো ক্ষণিক এবং আংশিক, কিন্তু আজ সে যেন সশরীরে অতীতে ফিরিয়া গেল। বিঠুর, কানপুর, সিপাহি ফৌজ, কোম্পানীর সেনাপতি এড্রিয়ান হোপ, হোপ গ্রাণ্ট, স্যার কলিন ক্যাম্বেল, স্বপক্ষের তাঁতিয়া টোপি, আজিমুল্লা খাঁ, জুবেদি বিবি।

আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদি বিবির নাম মনে পাড়িতেই সে শিহরিয়া ওঠে—এই দু'জনেই তাহার অধঃপতনের হেতু, নতুবা তাঁতিয়া টোপি বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের পক্ষে ছিল না।

নানা কি কখনো স্বপ্নেও ভাবিয়াছে যে বিদ্রোহীদের নেতা হইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামিবে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে তাহার অনেক অভিযোগ ছিল সত্য, তবু মীরাটে বিদ্রোহ ঘটিবার পরেও তাহার সহানুভূতি ছিল কোম্পানীর দিকে। কিন্তু এমন সময়ে একদিন যখন হাজার হাজার সিপাহী তাহার পায়ের কাছে হাতিয়ার রাখিয়া তাহাকে হিন্দুস্থানের বাদশা বলিয়া অভিবাদন করিল, যখন বলিল, যে কোম্পানী-রাজ তাহারা বরবাদ করিয়া এখন পেশবা-রাজ

প্রতিষ্ঠায় আসিয়াছে তখনো নানা আগুনে ঝাঁপ দিতে রাজি হয় নাই। তারপরে নানাকে দোমনা দেখিয়া যখন তাহারা জানাইল যে নানা যখন গদিতে চাপিতে রাজি নয়, তখন তাহারা দিল্লী যাত্রা করিতেছে, দিল্লীর বাদশাহকেই বাদশাহী ফিরাইয়া দিবে, যখন তাহারা জানাইল যে প্রয়োজন হইলে বাদশাহের পক্ষ হইয়া তাহারা কোম্পানীর গোলাম নানার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে তখন সে আর নীরব থাকিতে পারিল না, একখানা তরবারী কুড়াইয়া লইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, কোম্পানী-রাজ মুরদাবাদ ! পর মুহূর্তে সহস্র সিপাহি-কণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল, পেশবা-রাজ জিন্দাবাদ !

বাহাদুর শাহ ও তাহার নিজের কথা মনে পড়িবামাত্র এ হেন দুরবস্থার মধ্যেও নানা একপ্রকার কৌতুক অনুভব করিল ! মোগল সম্রাট ও পেশবা সম্রাট দুজনেরই আজ সমান অবস্থা !

নানার মনে পড়িল যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহার মতিগতি সম্বন্ধে স্বপক্ষের প্রধানগণ নিশ্চিন্ত ছিল না। বিদ্রোহীদের যেভাবে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, বন্দী ইংরাজদের প্রতি যে রকম সদ্ব্যবহার করিত, তাহাদের ধারণা প্রয়োজন হইলে এ সমস্তই কোম্পানী পক্ষে যোগদানের ভূমিকা। কোম্পানী পেশবার গায়ে হাত দিবে না, সিপাহিদেরও ভয়ের কারণ সামান্য, বেগতিক দেখিলে হাতিয়ারগুলা গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিয়া ভালো মানুষটির মতো নিজ গ্রামে গিয়া বসিবে। মরিতে মরিবে মাঝখানের মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা। ষড়যন্ত্র বিস্তার করিয়া তাহারা নানার হাত ইংরাজের রক্তে রাঙাইয়া দিবার চেষ্টা করিল যাহাতে আর সে দলত্যাগ না করিতে পারে, বিবিঘরের রক্তস্রোতে নানার হাত রঞ্জিত হইয়া গেল, দলত্যাগ করিবার পথ তাহার বন্ধ হইল। এসব সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তখন সে বোঝে নাই, পরে বুঝিয়াছে যখন ফিরিবার আর পথ ছিল না। সেদিনকার অস্পষ্টতা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই ষড়যন্ত্রের মূলে আজিমুল্লা খাঁ, এই ষড়যন্ত্রের অস্ত্র জুবেদি বিবি। তাহাদের নাম মনে পড়ায় সে আবার শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে এবং ঘৃণায়।

সে কেবল ভাবিতে লাগিল জুবেদি বিবি শয়তানী! নারী শয়তানীর মতো কোন্ শয়তান। তাহার মনে পড়িল উর্বশী ইন্দ্রের আয়ুধ, আর জুবেদি আজিমুল্লার আয়ুধ। ইন্দ্রের দুই আয়ুধ—বজ্র ও উর্বশী, আজিমুল্লা খাঁর দুই আয়ুধ তলোয়ার ও জুবেদি। মনোহর আয়ুধকে মানুষ সাধ করিয়া বুক পাতিয়া নেয়। নানাও একদিন সাধ করিয়া জুবেদিকে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিল।

বিঠুরের প্রাসাদে একদিন আজিমুল্লা খাঁ আবির্ভূত হইল।

নানা শুধাইল, কি খাঁ সাহেব, অনেকদিন দেখি নি, কোথায় ছিলে? সময় ক্রমে সঙ্কটের মুখে এগিয়ে চলছে, তুমি না থাকলে পেশবার রাষ্ট্রতরণী বানচাল হতে কতক্ষণ?

আজিমুল্লা খাঁ নানার ভারি বিশ্বাসভাজন। নানার স্বার্থ সংক্রান্ত দরবারে সে একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে। ইংরাজি বলিতে কহিতে, ইংরাজ সমাজে মিশিতে, কূটনীতির সূক্ষ্ম সূত্র চালনা করিতে তাহার জুড়ি নাই। তাহাকে না হইলে নানার অচল।

আজিমুল্লা খাঁ হাসিয়া বলিল—সম্প্রতি কাশ্মীর থেকে আসছি।

কাশ্মীর! সে যে ভূস্বর্গ! তা আমার জন্য কি আনলে? পারিজাত কুসুম মিললো কি?

পারিজাত তো ছার! খোদ উর্বশীকে এনেছি।

কেয়াবাৎ, শুনে লোভ হচ্ছে!

তা হ'লে দেখে চক্ষু সার্থক করুন।

তখন আজিমুল্লার ইঙ্গিতে পর্দার অন্তরাল হইতে তরুণী জুবেদি নানার সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

তাহার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে নানা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিলে নানা হাসিয়া বলিল—উর্বশী তাতে সন্দেহ নাই।

এটি নানার জন্মদিনের উপহার।

সে দিন নানার জন্মদিন ছিল।

কাশ্মীরের জাফরান কুঁড়ির মতো অলৌকিক তাহার রূপ। রক্ত মাংসের ভার ন্যূনতম সীমায় নামিয়া, হাসি চাহনি ও লাবণ্য, হাবভাব ও কলাবিলাস ঊর্ধ্বতম সীমায় চড়িয়া একটি অপূর্ব মহিমার সৃষ্টি করিয়াছে। বয়স? উর্বশীর আবার বয়স কি?

নানার মুগ্ধ ভাব দর্শনে প্রীত আজিমুল্লা বলিল, এ বস্তু নানার হারেমের যোগ্য।

কিন্তু নানার হারেম যে এ বস্তুর যোগ্য নয়, নূতন হারেম আবশ্যক।

অচিরে নূতন হারেম নির্মিত হইল আর নানা সেখানে দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটাইতে লাগিল। তখন তাহার কনিষ্ঠা পত্নী কাশীবাঈ নিতান্ত বালিকা, থাকিত পিত্রালয়ে।

নানা সদরে অন্দরে আজিমুল্লা খাঁর বশীভূত হইয়া পড়িল, সদরে সে স্বয়ং অন্দরে তাহার কুসুমায়ুধ জুবেদি।

আজিমুল্লার প্ররোচনায় নানা বিদ্রোহীপক্ষ অবলম্বন করিল। তবু ঠিক ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসিল না! আজিমুল্লার ইঙ্গিতে জুবেদি বিবি তাহার দুই হাত বিবিঘরের রক্তে রাঙাইয়া দিল, জাফরানের রঙ যে কিরূপ মারাত্মক লাল নানা তখন বুঝিল।

একদিন নানা জুবেদি বিবির ঘরে আসিয়া দেখে যে জুবেদি নাই। নানা অপেক্ষা করিয়া রহিল। আগে কখনো তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে জুবেদি আসিলে নানা শুধাইল, আজ অধমের প্রতি বিবি এমন নির্দয় কেন?

দু'এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া জুবেদি বলিল, আমি আর এখন বিবি নই, বাঁদী।

এই বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। সুন্দরী রমণীর চোখের জল রোধ করিতে পারে এমন বীরপুরুষ বিরল।

নানা ব্যস্ত হইয়া বলিল—কি ব্যাপার বিবি, কে তোমাকে বাঁদী বলেছে, এমন সাহস কার?

যথোচিত সাধাসাধির পরে জুবেদি বলিল—আর কারা? বিবিঘরের বিবিরা।

সেখানে গিয়েছিলে কেন ?

খাঁ সাহেবের অনুরোধে। তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখতে।

একটা কথাও সত্য নয়, আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদি বিবি দু'জনে মিলিয়া বানানো।

তা তারা কি বল্‌লো ?

বল্‌ল তারাই বিবি, আমি বাঁদী।

ওদের কথা ছেড়ে দাও, অনেকদিন বন্ধ আছে, কি বলতে কি বলেছে

আমি স্বাধীন আছি সে কি আমার দোষ! আর স্বাধীনতাই বা কোথায়? যেখানে বন্দীরা বিবিকে বাঁদি বলে এমন স্বাধীনতায় ধিক।

মনের দুঃখে ওসব কথা বলেছে।

আমি বুঝি খুব আনন্দে এসব কথা বলছি! আর শুধু কি কথা! এই দেখুন—বলিয়া পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখাইল নখচিহ্ন।

কেমন ক'রে হ'ল ?

রাক্ষসীরা আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে।

সব মিথ্যা। আজিমুল্লা স্বহস্তে কিছু দাগ করিয়া দিয়াছে।

কি সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন? ওদের শিরোপা পাঠিয়ে দিন! না জনাব, আমাকে অনুমতি দিন আমি কাশ্মীরে ফিরে যাই।

তোবা! তোবা! তুমি কাশ্মীরে গেলে আমি হিন্দুস্থানে কি করবো!

আপনিও বরঞ্চ চলুন। বিবিদের যে প্রতাপ দেখলাম, সাহেবদের প্রতাপ নাকি আরও কত বেশি। ওরাই এদেশে রাজত্ব করবে।

ওসব কথা যাক। তোমার কাশ্মীর যাওয়া হতে পারে না।

তবে বিবিদের সাজার ব্যবস্থা করুন।

স্ত্রীলোককে কি সাজা দেব ?

তবে সে ভার স্ত্রীলোকের উপরে ছেড়ে দিন।

কোথায় তেমন স্ত্রীলোক ?

কেন আমি আছি।

কি সাজা দেবে ?

রাজদ্রোহীর যোগ্য সাজা।

আচ্ছা অল্প সল্প তিরস্কার করে ছেড়ে দিও।

সে দেখা যাবে !

নানা ভাবিল ব্যাপারটা অল্পেই মিটিয়া যাইবে। জুবেদি যাহা ভাবিল তাহার পরিচয় বিবিঘরের কাণ্ড। সে তখনি আজিমুল্লা খাঁর কাছে গেল। আজিমুল্লা বলিয়াছিল কোন রকমে আধখানা বা সিকিখানা হুকুম আনিতে পারিলেই চলিবে। জুবেদি আস্ত একখানা হুকুম আনিল। নানা হত্যাকাণ্ডের আগে এ সবের কিছুই জানিতে পারে নাই, পরে সমস্তই বিশদ জানিয়াছিল কিন্তু তখন সে পলাতক, বিচার বা দণ্ডদানের ক্ষমতা তাহার আর নাই।

কাশীবাঈ এসব ঘটনার কিছুই জানিত না। বিদ্রোহের পূর্বে পিত্রালয় হইতে সে বিঠুরে আসিয়াছিল বটে কিন্তু বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিবামাত্র প্রিয়তমা পত্নীকে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে নানা নেপাল সীমান্তে পাঠাইয়া দিয়াছিল। কোম্পানীর ফৌজ বিঠুর অধিকার করিয়া লইলে নানা পলাইয়া আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইল এবং তারপরে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাণার কাছে আত্মসমর্পণ করিল—সে প্রসঙ্গ আগেই কথিত হইয়াছে।

আজ নির্জনে গভীর অন্ধকারে একাকী বসিয়া কত কথাই না তাহার মনে পড়িতেছিল, খুব সংলগ্ন আকারে নয়, ছেঁড়াছাড়াভাবে, তবু ভগ্ন সেতুর চিহ্ন দেখিয়া পূর্ণ সেতুর আভাস পাইবার মতো নানার চিন্তাধারা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। সে ভাবিতেছিল যাহা হইবার হইয়াছে, তাহার দণ্ডও সে পাইয়াছে। পেশবার সিংহাসনের অধিকারীর আজ ভিক্ষার অধিকার ছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও তাহার এক সান্ত্বনা ছিল, একটিমাত্র সুখ, বিবিঘরের জঘন্যতম পাপের বার্তা প্রিয়তমা পত্নীর কানে প্রবেশ করে নাই।

আজ সে সুখও গেল। নানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, যাইবেই বা না কেন, এতবড় পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে না?

কিন্তু সে কিছুতেই ভাবিয়া কূল পাইল না এ কথা কাশীবাঈয়ের কানে তুলিল কে? দু'জনে পারে আজিমুল্লা ও জুবেদি। আজিমুল্লার অন্দরে প্রবেশ নিষেধ। তবে পারে জুবেদি। কিন্তু সে-ই বা কোথায়! বিশাল হিন্দুস্থানের কোথায় সে আত্মগোপন করিয়াছে, হয়তো বা মরিয়াই গিয়াছে, আজ পাঁচ ছ বছর তাহার সন্ধান নাই। তবে এ খবর আসিল কাহার মুখে?

হাতের উপরে মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল কাশীবাঈ বলিয়াছিল, কাকের মুখে, বাতাসের মুখে! হয়তো বা সেই কথাই সত্য! সে ভাবিল পাপের গতি কুটিল আর অদৃষ্টের গতি গোপন। যে দুটি কানকে সে সযত্নে রক্ষা করিয়া যাইতেছিল অদৃষ্ট ঠিক আসিয়া সেই দুটি কানেই বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। সে কপালে কষাঘাত করিল, বুঝিল পত্নীর মনে তাহার জন্য যে শেষ আশ্রয়টুকু ছিল আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িল। পাপাচারীর জন্য যে তাহার মনে স্থান নাই, কাশীবাঈকে সে জানিত।

হঠাৎ সে ঋজু হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার শিথিল শরীর দার্ঢ্য অবলম্বন করিল, অন্ধকারে চোখ জ্বলিয়া উঠিল! সংবাদদাতাকে পাইলে একবার সে দেখিয়া লইত। নিজের পাপের দণ্ড সে ভোগ করিতেছে কিন্তু এত বড় দুষ্কৃতিকারীকে কখনোই সে অনাহত ছাড়িয়া দিত না। সুদীর্ঘ ত্রিশূল দণ্ডটা সে দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। এমন সময়ে কাহার তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসিতে তাহার চটকা ভাঙিয়া গেল, সে চমকিয়া উঠিল, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। হাসে কে? এই নির্জন অন্ধকারে তাহাকে ধিক্কার জানাইয়া হাসে কে? অদৃষ্ট?

একটু পরেই তাহার বাস্তবজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, এবারে হাসিবার পালা তাহার। ও হাসি নয়, নেপালী তরক্ষুর ডাক।

৩

রাণীমা, আমায় মাপ করো, ঐ এক কথা আর কতবার বলবো, বিশেষ ঐ বীভৎস ব্যাপারের কথা।

অনেকবার শুনেও যে বিশ্বাস হচ্ছে না।

কি করবে বলো? ও সব লড়াইয়ের ব্যাপার।

ওটা লড়াই হ'ল? একঘর ছেলেমেয়ে বুড়ো বুড়ীকে হত্যা··· লড়াই?

ও সব পুরুষালি কাণ্ডের আমরা কি বুঝি বলো?

পুরুষালি নয় জুবেদি, পৈশাচিক।

তুমি রাণী বড় মুখে ওসব বড় কথা বলতে পারো, আমি পুরুষালি ছাড়া আর কি বলবো?

যাই হোক, তুমি না জানলে তো জানতে পারতাম না, আমার জানা প্রয়োজন ছিল।

কেন?

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

পেশবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করবে?

করবো না। হিন্দু স্বামী-স্ত্রী এক অঙ্গ। ডান হাতে আঘাত লাগলে বাঁ হাতে ব্যথা করে।

অতশত জানি নে রাণীমা, দেশ ছেড়ে মক্কা শরিফে চলে যাচ্ছি, আর ফিরবো ইচ্ছে নেই, ভাবলাম তার আগে একবার রাণীমাকে দর্শন করে যাই। এখানে এসে কথায় কথায় সব বেরিয়ে পড়লো। আমার ধারণা ছিল পেশবা তোমাকে বলেছেন।

তিনি সব বলেছেন ঐ কথাটি ছাড়া।

কেন এমন হ'ল?

তিনি আমাকে বেশ জানেন, জানেন যে ও কথা শুনলে আমি প্রায়শ্চিত্ত শুরু করবো।

কি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ?

সকলের পক্ষে তো এক বিধান নয় !

আমার আবার ভয় ছিল পেশবার সম্মুখে প'ড়ে যাই ! তাহলে তিনি আর আস্ত রাখবেন না।

হাঁ কথাটা শুনে অবধি তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলেন কে বল্‌লো, তাকে তিনি দণ্ড দেবেন।

তা মা, আমার নাম তো বল নি ?

পাগল নাকি। তা ছাড়া তিনি আর আজ এখানে আসছেন না।

কেন ?

কোম্পানীর চর সর্বদা তাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ মেলায় ক জন লোকের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে বলবন্ত রাও আমাকে বললো, মা আজ পেশবাকে গ্রামে ঢুকতে নিষেধ করো। আমিও পেশবাকে সেই কথা বললাম। তিনি ওপারে একটা গুহায় রাত্রিযাপন করবেন, ভোর হবার আগেই রওনা হয়ে যাবেন। পূজো হলেই আমি তাঁর জন্য প্রসাদ নিয়ে ওপারে চলে যাবো।

তবে মা, আমি একটু নিশ্চিন্তে বসতে পারি।

হাঁ, তিনি আসবেন না, তোমার কোন ভয় নেই।

জুবেদি পেশবার আগমন সম্ভাবনায় সত্যই ভীত হইয়াছিল, এবারে নিশ্চিন্ত হইয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য জুবেদির দেশত্যাগ ও মক্কাযাত্রার কথা সর্বৈব মিথ্যা। হত্যাকাণ্ডের সংবাদটি কাশীবাঈকে দিবার জন্যই অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছিল।

এ রহস্যের মূল বোধ করি মানব স্বভাবে নিহিত। কাজেই ইহা যত অসম্ভব বোধ হোক, অস্বাভাবিক নয়।

জুবেদি বিবি এখন নির্বাপিত জ্যোতি। আলো নাই কিন্তু তাপ আছে। সেই তাপে নিরন্তর সে দগ্ধ হইতেছে, সেই তাপে তাহার অপূর্ব রূপ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ছাই হইয়াছে তবু তাপ যায় নাই। আগের মতো আগুন থাকিলে দাবানল কাণ্ড বাধাইয়া

দিত। এখন আছে শুধু তাপ, সেই তাপে কাশীবাঈয়ের হৃদয় তপ্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাহার এখানে আগমন। নানার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের তাহার হাতে এখন ইহাই একমাত্র অস্ত্র।

সিপাহী বিদ্রোহের দাবানলকে জুবেদী বিবি একটি স্বর্ণময় স্বপ্ন বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে ভাবিয়া লইয়াছিল যে নানাসাহেব হিন্দুস্থানের বাদশা হইলে সে দ্বিতীয় রৌশেনারা বা জেবুন্নিসা হইয়া সিংহাসনের পাদপীঠে বসিয়া বাদশাহকে চালনা করিবে। আবার কখনো কখনো অমিত-স্বপ্নপ্রবণ তাহার মন বলিত দ্বিতীয় নুরজাহান হইতেই বা বাধা কি ? সিংহাসনের পাদপীঠে কেন, অর্ধেক সিংহাসনে নয় কেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিখা আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে রাজিয়া সুলতানার কথা তাহার মনে পড়িত, হিন্দুস্থানের স্বর্ণচূড় সিংহাসনের নিঃসপত্ন অধিকারিণীরূপে সে নিজেকে দেখিতে পাইত।

এসব কথা কতটা সে নিজে ভাবিয়া আবিষ্কার করিয়াছিল আর কতটা কূট চতুর আজিমুল্লা খাঁ তাহার মনে ঢুকাইয়া দিয়াছিল তাহা জানি না। তবে ইহা সত্য যে জুবেদির উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে সে ইন্ধন জোগাইত, সিংহাসন-লাভের চন্দন কাষ্ঠের ইন্ধন। তাহার মোহকর সৌগন্ধ্যে মুগ্ধ বিভ্রান্ত জুবেদি কত কি স্বপ্ন দেখিত। আজিমুল্লা খাঁ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে নানাকে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না করিতে পারিলে সঙ্কটকালে সে কোম্পানী পক্ষে ফিরিয়া যাইতে পারে—আর কোম্পানী পক্ষে ফিরিয়া গেলে জুবেদির স্বর্ণ-সিংহাসন স্বর্ণ মেঘের মতো অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে।

তারপরে যখন সিপাহী-বিদ্রোহের দাবানল নিভিয়া গেল, জুবেদি আবিষ্কার করিল যে স্বর্ণ সিংহাসনের পরিবর্তে সে ভস্মস্তূপের উপরে সমাসীন। সে দেখিল যে তাহার ঐশ্বর্য, প্রতাপ, প্রতিপত্তি সমস্তই লোপ পাইয়াছে। শুধু তা-ই নয়, সে এখন কোম্পানীর হুলিয়াকৃত আসামী। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে শরবিদ্ধ মৃগের মতো ছুটিয়া বেড়ানোই এখন তাহার জীবন। তখন তাহার নির্বুদ্ধি-মনের প্রচণ্ড ক্রোধ পড়িল নানার উপর।

তাহার ধারণা হইল বর্তমান দুর্দশার ও ভাবী সিংহাসন-লোপের একমাত্র কারণ নানা। যে-রাগ বস্তুতঃ পড়া উচিত ছিল আজিমুল্লা খাঁর উপরে, কূটকৌশলী আজিমুল্লা খাঁ তাহা সম্পূর্ণরূপে নানার উপর লইয়া ফেলিল। তখন হইতে জুবেদি নানার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় ভাবিতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ হইলে নানাকে ধরাইয়া দিবার স্থূল প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিত। কিন্তু জুবেদি নারী, শুধু নারী নয়, চিরন্তনী নারী। সে চিন্তা করিয়া দেখিল নানার ফাঁসি হইলে তাহার নিজের কি লাভ? লাভ তো নানার। মৃত্যুতে তাহার সব দুঃখ ও গ্লানির অবসান ঘটিবে। সে ভাবিল বাঁচিয়া থাকিয়া নানা যাহাতে তীব্রতর দুঃখ পায়, সে নিজে যেমন পাইতেছে, তাহাই করিতে হইবে। সে জানিত দুস্তর সমুদ্রে নানার একমাত্র আশ্রয় কাশীবাঈয়ের হৃদয়। জুবেদি সতী রমণী নয়, কিন্তু সতী রমণীর হৃদয়ের মহিমা ও প্রেম সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। সে সঙ্কল্প করিল নানার সেই শেষ আশ্রয় নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ কোমলহৃদয়া কাশীবাঈ পতির নৃশংসতায় নিদারুণ মর্মপীড়া পাইবে, সেই পীড়ায় স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধও পীড়িত হইতে থাকিবে সে বিষয়ে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। নারী ছাড়া নারী-হৃদয়ের রহস্য কে বুঝিবে? নারী ছাড়া এমন নিষ্ঠুরই বা হইবে কে? শয়তান বোধ করি ছদ্মবেশী নারী।

৪

নানা উঠিয়া পড়িল। কি ভাবিয়া উঠিল সে নিজেও জানে না। বোধ করি চাপা অন্ধকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি রাত্রির শীতল স্পর্শে দুর্লভ গৃহাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকিবে। কোন সন্ন্যাসীই ষোল আনা সন্ন্যাসী নয়, মনের মধ্যে কোথায় একটুখানি গৃহী লুকাইয়া থাকে। গ্রামে গুপ্তচরের উপস্থিতির

সম্ভাবনাকে সে তেমন আমল দিল না, একে রাত্রি অন্ধকার, তাহাতে আবার সন্ন্যাসীর বেশ। নানা ধীরে ধীরে নদীগর্ভে নামিল, সন্তর্পণে নদী পার হইয়া গ্রামের তীরে উঠিল। মেলায় লোকজন তখনো জাগ্রত ছিল, মেলার দিকটা এড়াইয়া ঘুরপথে কাশীবাঈয়ের গৃহের দিকে চলিল।

নানা জানিত অনেক বোঝা তাহার মাথায় চাপিয়াছে। সে জানিত হয় কোম্পানীর হাতে নয় বিধাতার হাতে তাহার দণ্ড পাইতে হইবে, কিন্তু অতর্কিতভাবে কাশীবাঈয়ের তৃতীয় হস্ত যে বিচারক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে নানা তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। পত্নীর বিরূপতায় তাহার সমস্ত মন বিকল ও বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সমস্ত ক্রোধ ও হিংসা অজ্ঞাত সংবাদদাতার উপরে পড়িয়াছিল। কিন্তু কে সে? কোথায় সে? কাশীবাঈ তাহার নাম করিবে না নানা নিশ্চয় জানিত। আর করিলেই বা কি? পলাতক আসামী নানা, তাহার দণ্ড দানের ক্ষমতা কই? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে সে পথ চলিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে নিরাপদে কাশীবাঈয়ের গৃহপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; সে দেখিতে পাইল ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আর একটু অগ্রসর হইলে শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে দু'জনের কণ্ঠস্বর। কৌতূহলী নানা নীরবে আগাইয়া গিয়া মুক্ত দ্বার-পথে ভিতরে তাকাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পিশাচী, তোমারই কীর্তি! নানা দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া, সমস্ত স্থৈর্য ও ধৈর্য শুভাশুভ ভুলিয়া সগর্জনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ওহো শয়তানী তোমারই কীর্তি!

কাশীবাঈ ও জুবেদি কেহই নানাকে প্রত্যাশা করে নাই, তাহার অতর্কিত আগমনে দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল, জুবেদি পালাইবার প্রচেষ্টা করিতেও ভুলিয়া গেল।

জুবেদি প্রথমে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল এবং আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তার আগেই—শয়তানী, এই নাও বলিয়া সবলে সবেগে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিশূল দণ্ড চালনা করিল। ঠিক

সেই মুহূর্তে কাশীবাঈ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল এবং কি করো, কি করো বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। নানার লক্ষ্যভ্রষ্ট ত্রিশূল কাশীবাঈয়ের বক্ষ বিদ্ধ করিল। এসব ব্যাপার বর্ণনায় কিছু সময় লাগিল, ঘটনায় এক মুহূর্তে ঘটিয়া গেল।

হতবুদ্ধি নানা ত্রিশূলবিদ্ধ পত্নীর বুকের উপরে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কাকুবাঈ, কাকুবাঈ।

কাশীবাঈ অন্তিম কণ্ঠে বলিল—এই প্রায়শ্চিত্তের আমার প্রয়োজন ছিল। ভালই হল যে তোমার হাতে হয়েছে।

তারপর সে আর কথা বলিতে পারিল না।

অসহায় বিমূঢ় নানা শিশুর মতো তাহার পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, প্রায়শ্চিত্ত, তোমার নয় আমার।

এই অবসরে জুবেদি ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, পালাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু নানার খেদ শুনিয়া উত্তর দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—নানা, তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব আছে, আর সে প্রায়শ্চিত্ত এ ভাবেও হবে না। মারাঠা সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে, সিপাহি বিদ্রোহের নেতাকে সকলে আমূল ভুলে যাবে সে-ই হবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত। তুমি ধরা দেবার জন্য হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে হেঁকে হেঁকে বেড়াবে, 'আমি নানা, আমাকে গ্রেপ্তার করো,' কোম্পানীর চৌকিদারটাও ফিরে তাকাবে না, সেই হবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত। তুমি বিস্মৃত হবে, উপেক্ষিত হবে, অবজ্ঞাত হবে, নিজের ছায়ায় চেয়েও তুমি মিথ্যা হয়ে যাবে, সেই হবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত।

তারপরে সে দুই পা আগাইয়া আসিয়া কণ্ঠস্বরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মিশাইয়া বলিল—কুর্নিশ পেশবা সাহেব, বাঁদীকো বিদায় দিজিয়ে।

এই বলিয়া সে খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াও ধরিবার কোন চেষ্টা নানা করিল না, মৃত পত্নীর পদপ্রান্তে সে পড়িয়া রহিল।

পরদিন পরিজনেরা মৃতদেহটি বা নানা কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

*

রক্তের জের

আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাস লিখিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি বা অভিপ্রায় আমার নাই। তবে একথা সত্য যে আমি ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠক। ইতিহাস পড়িয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় যেসব তথ্য সমষ্টীকৃত হয়, অনেক সময়েই সেসব সত্যের ছিবড়ে, প্রকৃত তথ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পৌছায় না। পৃষ্ঠার চেয়ে পাদটীকার মূল্য অনেক সময়েই অধিক, আর লোকের মুখে মুখে ও জনশ্রুতিতে যেসব কথা বাতাসের বেগে ধূলোর মতো ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতেই সত্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত তথ্য জানিবার আশায় উত্তর ভারতের শহরে গ্রামে বাজারে বাজারে আমি অনেক বেড়াইয়াছি, এখনো বেড়াইতেছি। এই রকম ভ্রমণের মুখে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝান্সী শহরে উপস্থিত হইয়া ডাক বাংলোয় আশ্রয় লইলাম। ঝান্সী শহর সিপাহী বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। যদিচ সে অনেক দিনের কথা, তবু এখনো এখানে এমন লোক নিশ্চয় আছে, যাহারা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে জীবিত ছিল, আমি নিজেও তো সেই রকম একজন লোক ; এমন লোক নিশ্চয় অনেক আছে, যাহারা সে সময়ে কোন না কোন পক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, আমি নিজেও তো সেই রকম একজন লোক। আমি তাহাদেরই সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু বিপদ এই যে, যাহারা সে সময়ের কথা হাতে নাতে জানে, তাহারা মুখ খুলিতে চায় না। নিজেদের মধ্যে খুব সম্ভব সেসব কাহিনীর আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু অপরিচিতের কাছে একেবারেই মূক। আমি মূককে বাচাল করিবার অসাধ্য সাধনে বাহির হইয়াছি। আর পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন? তাহার দৃষ্টান্ত তো আমি স্বয়ং, সিপাহীর গুলীতে আমার একটি পা বিকল।

ডাক বাংলো প্রায় খালি, কেবল আভাসে বুঝিলাম যে, একটি

ঘরে আর একজন লোক আছে। কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটি বাহিরে আসিলে দেখিলাম যে, তাহার বয়স আমার চেয়ে কম তো নয়ই, বরঞ্চ বেশি হইবে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, কেননা, লোকটি একেবারে শুকাইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, বয়স চল্লিশ হইতে আশির মধ্যে যে-কোন অঙ্কে স্থাপন করা যাইতে পারে। চৌকিদার তাহাকে মুন্সাজী বলিয়া সম্বোধন করিল, আমিও তাহাই করিব; অনেকবার তাহার উল্লেখ করিতে হইবে; তাহার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে যে কাহিনীটি শুনিলাম তাহাই এখন বলিব।

আমি বারান্দায় যেখানে বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে মুন্সীজী আর একখানি চেয়ারে বসিলেন। এখন দুজন প্রায় সমবয়স্ক লোক নির্জন এক গৃহে অবস্থান করিলে আলাপ পরিচয় হইবে না, এমন প্রায়শ হয় না, তা তাহাদের মধ্যে জাতিগোত্রের যতই ভেদ থাকুক না কেন?

বিশেষ আমার কেমন যেন ধারণা হইল যে, এই রকম জীর্ণ ভাণ্ডারেই আমার আকাঙ্ক্ষিত সত্য থাকিবার সম্ভাবনা, সীসার বাক্সেই তো পোর্শিয়ার চিত্রপট রক্ষিত ছিল।

তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে শুধাইলাম, আপনি কোথায় যাবেন?

কানপুরে।

কানপুরে? আমি তো সেখান থেকেই আসছি।

সেখানে আপনার কি কাজ ছিল?

ঘুরে বেড়ানোই এখন কাজ।

সরকারী চাকুরীতে আছেন?

এক সময় ছিলাম, এখন পেন্সন পাই।

আপনি?

আমিও সরকারের পেন্সনভোগী।

কি কাজ করতেন?

মাস্টারী করতাম লোকে তাই মুন্সীজী বলে।

কোথায় মাস্টারী করতেন ?

উনাও শহরে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাহলে উনাও শহরে ছিলেন ?

তখন কি ইস্কুল কলেজ খোলা ছিল ? তাছাড়া বিদ্রোহের পরে আমি মাস্টারীতে ঢুকি।

তখন কি করতেন ?

এমন কিছু নয়।

বুঝিলাম রহস্যদ্বার এবারে বন্ধ হইল। আরও কৌশল চাই, আরও ধৈর্য চাই।

আপনি কি করতেন ?

৯৩ নম্বর সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্টের সার্জেণ্ট ছিলাম।

বটে, দিন হাত দিন, আমি কিছুদিন ঐ রেজিমেণ্টের নেটিভ হিসাবরক্ষক ছিলাম।

তখন বোধ হয় আমি সামরিক পদ থেকে বিদায় নিয়েছি।

তা হবে, আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। তা হোক, তবু তো এক রেজিমেণ্টের লোক।

এবারে রহস্যদ্বার আবার খুলিল।

মুন্সীজী, পুরানো দিনের খাতিরে দু'একটা পেগ খেতে আপত্তি কি ?

আপত্তি! বিলক্ষণ। মুন্সী হবার পরে ওসব ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন তো মুন্সীগিরির পূর্বজীবনে ফিরে গিয়েছি। তা ছাড়া রাতের বেলায় দেখছেই বা কে ?

আর দেখলেই বা দোষ কি ?

দোষ কি জানেন, লোকে ইস্কুল মাস্টারদের সাধারণ ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কামনার উর্ধ্বে বলে জানে। তারা একজন সামান্য কেরাণীকে মদ খেতে দেখলে বলবে, বাহাদুর ছেলে বটে। কিন্তু একজন স্কুল

মাস্টারকে যদি একটা মাতালের সঙ্গেও দেখতে পায়, অমনি বলবে এই রে দেশটা জাহান্নমে গেল!

তাই নাকি? আমাদের দেশে তো এমন নয়।

সেই জন্যই তো আমাদের দেশে ইস্কুল মাস্টারের বেতন এত সামান্য, যাতে তারা শাক-ভাতের বেশি কিছু খেতে না পারে।

এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল, মুখের গহ্বরে দন্তের আত্যন্তিক অভাব; হাসির তালে তালে গালের রেখাগুলি সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, কতকটা তাহাকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে।

তা আপনি এমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? পেন্সন পান, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করুন।

তাই তো করা উচিত, কিন্তু মাথায় এক ভূত চেপেছে, তাই ঘুরে মরছি। আমি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি।

সরকারের তরফ থেকে?

না, না সরকারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া যে-ঘটনা অনেক কাল চুকে বুকে গেছে, তার তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে সরকার কেন টাকা খরচ করতে যাবে।

আপনি যখন সরকার পক্ষের কেউ নন, আর আমরা যখন এক রেজিমেণ্টের লোক, তখন আপনাকে গোপনে বলি, between ourselves বুঝলেন কিনা, কিছুই চুকে যায় নি।

আবার বিদ্রোহ হবে নাকি?

তার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমি বলছি পুরাতন বিদ্রোহের জের আজও চলছে।

আজও চলছে? সে আবার কি রকম?

কিছু দিন আগে জব্বলপুরের কাছে মেজর নীল তার বডিগার্ড মজর আলির হাতে নিহত হয়েছিল মনে আছে?

আছে বই কি! বোধ করি মার্চ মাসে হবে—১৪ই মার্চ।

মনে থাকবার কারণ হচ্ছে যে মজর আলি মেজর নীলের পেয়ারের লোক, আরও কারণ আছে হত্যার কোন অভিপ্রায় খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু কাগজে কি পড়েন নি যে, মজর আলির জেনানার সঙ্গে মেজর নীলের যোগাযোগ ঘটেছিল, দু'জনেরই অল্প বয়স।

এসব কথা বেরিয়ে থাকবে হত্যার পরে, সব কাগজ পড়ি নি, বিশেষ তখন আমি পথে পথে ঘুরছি, সব কথা জানি নে।

সব কথা কেউ-ই জানে না।

আপনি জানেন কি ?

জানি বই কি। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শুনবার কৌতূহল থাকে বলবো। তার আগে একটা তথ্য শুনুন—সেই একটা তথ্যের আলোতে অনেকটা অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে আসবে। মেজর নীল সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বিখ্যাত জেনারেল নীলের পুত্র।

জেনারেল নীলের পুত্র! আমি চমকিয়া উঠিলাম। মুন্সীজীর কথাই সত্য, এই একটিমাত্র তথ্যে মেজর নীলের হত্যার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া গেল বটে।

কি বিশ্বাস হচ্ছে না ? চুপ যে !

বিশ্বাস হয়েছে বলেই চুপ ক'রে আছি। কিন্তু মজর আলির পরিচয় কি ?

মজর আলি হচ্ছে সফর আলির পুত্র।

সফর আলি কে ?

সব বলছি। আর দুটো পেগ আনতে হুকুম দিন, গলাটা ভিজিয়ে নিই, অনেকক্ষণ থেকে বকছি।

আমার চাপরাসি পেগ আনিল, দুইজনে পান করিলাম, মুন্সীজী রুমালে বেশ করিয়া মুখ মুছিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিলেন—সফর আলি জেনারেল নীলের আদেশে নিহত হয়েছিল।

নিহত হ'য়েছিল ?

জেনারেল নীলের অবশ্য বিশ্বাস তিনি বিচার করে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন।

তার অপরাধ?

তখন ৯৩ নম্বর কি কানপুরে ছিল না?

৯৩ নম্বর জেনারেল নীলের অনেক পরে কানপুরে এসে পৌঁছেছিল। আর কানপুরে উপস্থিত থাকলেই বা কি, তখন প্রত্যহ এত লোকের ফাঁসির হুকুম হ'ত যে কারো কথা বিশেষ করে মনে থাকবার নয়। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন মুন্সীজী, সে ঘটনার ত্রিশ বছর পরে আজ কোন্ সূত্র জের টেনে চলছে এই দুই ঘটনার মধ্যে!

রক্তের সূত্র, সার্জেণ্ট সাহেব, রক্তের সূত্র। রক্তের জের পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে চলে, জন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে। পিতার রক্ত পুত্রে সংক্রামিত হয়, সেই রক্তের সঙ্গে তার আশা আকাঙ্ক্ষা, দোষ এবং গুণ, সমস্ত সংক্রামিত হয় পুত্রের দেহে, পুত্রের ব্যক্তিত্বে! যাক্ ব্যাখ্যা যাক, এখন ঘটনাটা বলি শুনুন।

জেনারেল নীল আর জেনারেল হ্যাভেলক কানপুরে পৌঁছবার আগেই বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তার নৃশংসতায় তার বীভৎসতায় ইংরেজ সৈন্য আর সেনাপতিদের মন চড়া সুরে বাঁধা। সূক্ষ্মভাবে আসামী অনুসন্ধান করবার মতো ধৈর্য তাদের ছিল না, যার উপরে সন্দেহের একটুখানি ছায়া পাওয়া গেল তাকেই ফাঁসি দেওয়া হ'ল—বাছবিচার নেই। সফর আলি ছিল কোম্পানীর কোন্ এক রেজিমেণ্টের দফাদার। নীল কোন্ সূত্রে জানতে পেলেন যে সফর আলি জেনারেল হুইলারের হত্যার জন্য দায়ী।

সে তো বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের আগের ঘটনা।

অবশ্যই আগের। নানার সঙ্গে চুক্তির সর্তমতো হুইলার পাল্কী চড়ে সতীচৌরা ঘাটের দিকে যাত্রা করেছেন, সেখানে নৌকো আছে—হুইলার ও অন্যান্য গোরা লোক কল্‌কাতায় যাত্রা করবে। অন্য সকলে হেঁটে গিয়ে নৌকো চড়লো, কেবল হুইলার গেলেন পাল্কীতে, তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি সতীচৌরা ঘাটের কাছে যেমনি

পাল্কী থেকে নামতে যাবেন, পিছন থেকে কে তাকে হত্যা করলো। নীলের বিশ্বাস হয়েছিল সফর আলিই সেই হত্যাকারী।

প্রমাণ ছিল?

আসল প্রমাণ ছিল নীলের মনে, তার চোখে প্রত্যেকটি সিপাহীই কোন না কোন দোষে দোষী। নীল হুকুম দিল সফর আলির ফাঁসির।

সফর আলি কোরাণ স্পর্শ ক'রে বলল সে নির্দোষ। সে বলল, যে, সে বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তার মতে সে দোষটাও কোম্পানীর কেননা কোম্পানী বিদ্রোহের পীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু হুইলারের দূরে থাকুক, কোন হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে সে জড়িত নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

তারপরে?

এখনি শেষ হয় নি আরও আছে শুনুন। সিপাহী পক্ষের নৃশংসতা গোরা লোকের মন কি রকম নৃশংস, কি রকম বীভৎস করে তুলেছিল শুনুন। যাদের ফাঁসির হুকুম হ'ত ফাঁসির আগে তাদের কি করতে হ'ত মনে আছে?

শুনেছি।

আর একবার শুনুন। বিবিঘরের মেঝেতে জমাট বাঁধা রক্ত জিব দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে হ'ত তার পরে ফাঁসি। সফর আলিকে বিবিঘরে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সে অস্বীকার করলো।

তখন?

তখনকার জন্যও ব্যবস্থা ছিল, নীল সাহেব বিচক্ষণ সেনাপতি। মেজর ব্রুসের মেথর বাহিনী চাবুক নিয়ে প্রস্তুত থাকতো। সফর আলির পিঠের চামড়া কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। তাকে করতে হ'ল নির্দেশ মতো কাজ।

তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল ফাঁসিতলায়। অন্যান্য শহরে কাজটা যে-কোন গাছের ডালে সমাধা হত কিন্তু কানপুর শহরে পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নীল সাহেব বিচক্ষণ ব্যবস্থাপক। সফর

আলি নির্ভয়ে ফাঁসির মাচানে উঠে দাঁড়ালো। নীল সাহেবের আর একটা হুকুম ছিল এই যে, শহরের নেটিভদের সকলকে হাজির হয়ে ফাঁসি দেখতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে সতর্ক হতে পারে। সফর আলি সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করলো। সমবেত জনতাকে সম্বোধন ক'রে সে বল্‌ল—

ভাই সব হিন্দু মুসলমান, তোমরা সবাই দেখো নীল সাহেব নিরপরাধ একজনকে হত্যা করছে। ভাই সব হিন্দু মুসলমান, তোমরা সবাই জেনে রাখো হুইলার সাহেবের বা কোন লোকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই!

ভাই সব তোমরা দেখো, তোমরা জানো, তোমরা বোঝ যে আমি নির্দোষ! যে-লোক নিতান্ত মিথ্যাবাদী, তারও মুখ থেকে মৃত্যুকালে মিথ্যা বের হয় না! আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নি! তোমাদের সকলের কাছে নিরপরাধ মুমূর্ষু সফর আলির এই শেষ আরজি যে তোমরা কেউ বিষণগড়ে গিয়ে সফর আলির পুত্র মজর আলিকে তার বাপের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানিয়ে বলো, সে যেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। এখন মজর আলির বয়স দুই বছর, কিন্তু সময় তো ব'সে থাকে না, একদিন সে লায়েক হবে, জোয়ান হবে, আমি আশীর্বাদ করছি সোরাবের মতো হবে, তখন যেন প্রতিশোধ নিতে ভুলে না যায়। ততদিনে নীল সাহেব যদি দোজকে গিয়ে থাকে তবে তার ছেলেকে যেন হত্যা করে, সে বেটাও যদি দোজকে যায়, তবে যেন তার ছেলেকে হত্যা করে। তোমরা তাকে বুঝিয়ে বলো এই হচ্ছে গিয়ে তার বাপের শেষ আকাঙ্ক্ষা। তাকে বুঝিয়ে বলো পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি তার কাল হয়, তবে তুমি হিন্দু ভাই তাকে বুঝিয়ে বলো সে স্বর্গে যাবে, তুমি মুসলমান ভাই তাকে বুঝিয়ে বলো সে বেহেস্তে যাবে! তাকে বুঝিয়ে বলো রক্তের বদলে রক্ত না পাওয়া অবধি তার বাপজীর তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, আল্লার কাছে গিয়েও তার নিবৃত্তি নাই। যাও ভাই সব উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও, পূর্বে যাও, পশ্চিমে যাও, যেখানে খুশী সেখানে

যাও, কেবল বিষণগড়ে যেতে ভুলো না, ভুলো না যে সফর আলির পুত্রের নাম মজর আলি। আল্লা তোমাদের কৃপা করবেন।

তারপরে সফর আলি নতজানু হ'য়ে ঊর্ধ্বমুখে, আকাশের দিকে হাত দুটি প্রসারিত ক'রে বল্‌তে লাগলো, আল্লা, রক্তের বদলে রক্ত না পাওয়া অবধি তোমার বেহেস্তেও যেন আমার শান্তি না হয়, আমার তৃপ্তি না হয়! আল্লা মজর আলিকে আয়ু দাও, শক্তি দাও, বীরত্ব দাও, বাপের শেষ আকাঙ্ক্ষা না ভুলবার মতো স্মৃতি দাও, ধৈর্য দাও, বুদ্ধি দাও! তারপর তাকে বাপের কাছে পৌঁছে দাও! আল্লা পীর ফকিরের মুখে শুনেছি মৃত্যুকালে লোকে শত্রুকে ক্ষমা ক'রে মরে, কিন্তু মনে যদি ক্ষমার ভাব না থাকে মুখে ক্ষমার কথা আসবে কি ক'রে! আল্লা, তোমার সফর আলির মুখে যে মিথ্যা কথা বের হয় না সে তো তোমারই মর্জিতে! আমার এই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষার জন্য যদি তুমি আমাকে দোজকে প্রেরণ ক'রে থাকো সে-ও ভালো, সে-ও ভালো, কিন্তু প্রতিশোধ বিনা বেহেস্ত-লাভ! না, না, আল্লা, তেমন বেহেস্তে তোমার নফর সফর আলির কিছুমাত্র লোভ নেই!

এই রকম কত কথা বল্‌ল, আজ ত্রিশ বছর পরে সে সব আর মনে নেই। সে থামলে তার ফাঁসি হ'য়ে গেল।

তারপরে?

জনতা নিঃশব্দে সরে গেল।

তুমি কোথায় ছিলে?

সে কথা থাক্‌।

সফর আলির শেষ আকাঙ্ক্ষা মজর আলি কাছে পৌঁছেছিল?

নইলে মেজর নীলের মৃত্যু হ'ল কেন?

এতকাল পরে?

শয়তানের চাকা শীঘ্র ঘোরে, ভগবানের চাকা ঘুরতে সময় নেয়।

মজর আলিরও তো শুনেছি যে, ফাঁসি হ'য়ে গিয়েছে।

নইলে সফর আলি তাকে আশীর্বাদ করবে কি উপায়ে?

তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে?

আরও অনেক জানি, শোন।

আবার একটু গলা ভিজাইয়া লইয়া মুন্সীজী পুনরায় আরম্ভ করিল—ক্রমে মজর আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হ'ল। তার বাপ যেমন অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল তেমনি জোয়ান হ'য়ে উঠল, আর লাঠি, সড়কি, তলোয়ার ও বন্দুকে হ'য়ে উঠল ওস্তাদ। সেই সঙ্গে সামান্য লেখা-পড়াও শিখলো। তার পরে চাকুরির সন্ধানে বেরিয়ে মেজর নীলের বডি গার্ডের চাকুরী পেলো।

সেটা কি তাকে হত্যা করবার অভিসন্ধি নিয়ে?

না, পিতার আকাঙ্ক্ষা তখনো জানতে পায় নি। ওটুকু ভাগ্যের খেলা। তার পরে মেজর নীল জব্বলপুরে বদলি হলে মজর আলিও সঙ্গে গেল।

খবর পেল কোথায়?

ওখানে।

কি ভাবে?

একজন ফকির একদিন এসে তার হাতে একখানা ছাপা কাগজ দিয়ে চলে গেল। কাগজখানা পড়বার পরে সে যখন ফকিরের সন্ধান করলো তখন কোথাও তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

কে সেই ফকির?

সে কথা থাক্।

কি ছিল কাগজখানায়?

সফর আলির অন্তিম অভিপ্রায়।

কে ছাপালো?

কেউ জানে না। ঐ কাগজের হাজার হাজার কপি সারা উত্তর ভারতের হাটে বাজারে গঞ্জে তখন প্রচারিত হচ্ছিল। খুব সম্ভব তারই একখানা ফকিরের হাতে এসে পড়েছিল আর সে ঘটনাক্রমে মজর আলিকে জানতো—তাই সে তার হাতে পৌঁছে দিয়েছিল।

তুমি সে কাগজ দেখেছেন?

দেখেছি। খুব সম্ভব এখানে এক কপি কাছে আছে। দাঁড়াও দেখছি আছে কিনা।

এই বলিয়া মুন্সীজী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একখানা ছোট আকারের জীর্ণ কাগজ হাতে ফিরিয়া আসিল।

এই দেখ।

দেখিলাম যে প্রথমে উর্দুতে পরে ইংরাজীতে লেখা। পড়িলাম, সফর আলির অন্তিম অভিপ্রায় মজর আলির উদ্দেশে লিখিত।

এই কাগজ পড়েই কি সে সব কথা জানতে পারলো ?

না, আগেও কানাঘুষায় কিছু শুনেছিল, কিন্তু মেজর নীলের নামটা জানতে পারে নি।

মেজর নীল যে জেনারেল নীলের পুত্র তা জানলো কি ক'রে ?

সেটা আগেই জানতে পেরেছিল, মেজর নীলের বসবার ঘরে জেনারেল নীলের একখানা ছবি ছিল।

তখন সঙ্কল্প স্থির করে ফেল্‌লো ?

অত সহজে স্থির করতে পারে নি। একদিকে মেজর নীল তার প্রভু, তাকে খুব স্নেহ করেন, আর এক দিকে পিতার অন্তিম অভিপ্রায়—কঠিন পরীক্ষা। তাছাড়া ইতিমধ্যে—

আবার কি হ'ল ?

আমিনা বলে' একটা মেয়েকে সে ভালোবেসেছে—বিবাহের দিনও প্রায় স্থির। ইতিমধ্যে ফকিরের হাতে এলো এই ফর্মান। মজর আলি মনঃস্থির করতে না পেরে পাগলের মতো হয়ে গেল, কি করবে, কি তার কর্তব্য। কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে বেঁচে যেতো, কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করবে—এ কথা কি কাউকে বলা যায় ?

কেন ঐ আমিনাকে ?

সে যে স্ত্রীলোক, সে কি কখনো সম্মতি দিয়ে ভাবী স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতে পারে ?

মজর আলি একবার ভাবলো, দূর ছাই এসব শয়তানের কারসাজি ; যেমন চলছে চলুক। আর একবার ভাবলো চাকরী ছেড়ে দিয়ে

আমিনাকে বিয়ে ক'রে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু না তা হবার নয়, দিনে রাত্রে পিতার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা তাকে প্ররোচিত করতে লাগলো।

তার ভাবগতিক দেখে মেজর নীল শুধালো, মজর আলি তোমার হ'ল কি ?

মজর আলি প্রভুর মুখের দিকে তাকায়, তার পিতার অভিপ্রায়কে শয়তানের কারসাজি মনে হয়। সে ভাবে জেনারেল নীল যদি অপরাধ ক'রেই থাকে তার জন্য মেজর নীলের অপরাধ কি ? আবার ভাবে এত ভাববার অধিকার তার নেই, পিতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সে বাধ্য।

আমিনা শুধায়, তোমার কি হ'ল ? মজর আলি কিছু বলে না।

আমিনা বিয়ের তারিখ স্থির করতে বলে, মজর আলি টালবাহানা করে। এই রকম চলতে লাগলো।

একদিন বিকালে মজর আলি জব্বলপুর টাউনে গিয়েছে, কেনাকাটা সেরে ফিরবার সময়ে দোকানে একখানা ছবি দেখতে পেলো—একজন আসামী ফাঁসীর মাচানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, নীচে চারপাশে জনতা, লোকটি হাত নেড়ে কি যেন বলছে। ছবির পরিচয়লিপি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে পড়তে পারলো না। তখন সে দোকানীকে শুধালো, মিঞা—এ কিসের ছবি ?

দোকানী বল্‌ল, সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার ছবি, কোম্পানী একটা লোকের ফাঁসীর হুকুম দিয়েছে, আর জনতাকে সে বলছে, সে নির্দোষ।

আসামীর নাম কি ?

তা কে জানে !

সে সময়ে একরকম ছবি চারিদিকে দেখতে পাওয়া যেতো, লক্ষ্মী-বাঈ যুদ্ধ করছে, নানাসাহেব পালাচ্ছে, জেনারেল উট্রাম সসৈন্যে লখনৌ চলেছে। মজর আলি সে-সব ছবি দেখেছে, কিন্তু এ ছবিটা তার কাছে নূতন, তার মনে হল ঐ আসামী তার বাপ।

তখন সে পকেট থেকে ফকিরের দেওয়া সেই কাগজখানা বের

ক'রে দোকানীকে বল্‌ল—মিঞা আমি ইংরেজি পড়তে পারি না, তুমি বুঝিয়ে দাও তো।

দোকানী কাগজখানা দেখে বল্‌ল—নূতন ক'রে আর কি পড়বো? এ কাগজ অনেকবার দেখেছি।

মজর আলি শুধালো, মজর আলির খোঁজ জানো?

দোকানী বল্‌ল—সে বেইমানের খোঁজ কে জানতে চায়?

বেইমান কেন?

কেন আবার? বাপের শেষ আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ করতে পারে না, সে বেইমান ছাড়া আর কি? যাও, যাও, সে বেটা বেইমানের কথা তুলো না।

মজর আলি নীরবে চলে গেল। আর ফিরবার পথে একখানা শাড়ী, আর কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি কিনে নিয়ে সন্ধ্যার পরে আমিনার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

আমিনাকে বল্‌ল—কেমন হয়েছে দেখো তো?

তুমি যা দাও তা কি খারাপ হতে পারে?

আমার বুঝি কিছুই খারাপ নয়?

কেবল তোমার গম্ভীর ভাব ছাড়া। আচ্ছা ক'দিন থেকে তুমি এমন বিষণ্ণ কেন?

তুমি ত কেবলই আমাকে বিষণ্ণ দেখো। কই আর কেউ তো বলে না।

আর কেউ তোমাকে এমন ক'রে জানে কি? আমি তোমার মনের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাই।

কি দেখছ বলো তো?

দেখছি যে শীগ্‌গীরই তুমি কাজে ইস্তফা দেবে।

কেন?

কানপুরে ফিরে যাবে।

কেন, সেখানে ফিরবো কেন?

সাদি করতে।

কাকে সাদি করবো ?

খুব সুন্দর একটা মেয়েকে।

তোমার চেয়ে সুন্দর আর কে ?

তবে আমাকেই।

তখন দুজনেই হেসে উঠল। তারপরে মজর আলি বলিল—এই যদি আমার মনের কথা তবে আমি বিষণ্ণ হ'তে গেলাম কেন ?

তা-ও জানি।

বলো।

মেজর সাহেব তোমাকে খুব ভালবাসে, তাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে।

মোটেই নয়। দরকার হ'লে মেজর সাহেবকে আমি খুন করতে পারি।

তবে আমাকেও খুন করতে পারো।

না তা পারি না।

তবে কি মেজর সাহেবের চেয়ে আমাকে বেশী ভালোবাসো ?

তোমার কি মনে হয় ?

এখন বলবো না, খাওয়ার পরে যাওয়ার সময়ে বলবো। তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা তাই হবে।

আজ যে বড় ভালো ছেলে।

কোন্ দিন আমি খারাপ ?

বিয়ের পরে ভালো ছেলে থাকো, তবে তো বুঝি।

এই বলে আমিনা হেসে উঠল, আর বলল, একটু অপেক্ষা করো তোমার খাওয়ার যোগাড় করিগে।

আহারান্তে মজর আলি বিদায় নেবার সময় বলল, আমিনা এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমিনা এমন নিঃসংশয়ভাবে উত্তর দিল যে, তাতে মজর আলির মুখ বন্ধ হ'য়ে গিয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর ক'রে দিল।

মজর আলি বলল—এমন উত্তর পেলে মৃত্যুকে আর ভীষণ মনে হয় না।

মৃত্যুর কথা কেন বল্‌ছ ?

মারতে গেলেই মরতে হয়, আমরা সৈন্য, লোক মারাই তো হচ্ছে আমাদের কাজ।

অন্যের যাই হোক, তোমার কাজ লোক মারা নয়; তোমার কাজ মেজর সাহেবকে রক্ষা করা।

তা বটে!

আর ওসব অলুক্ষণে কথা এখন থাক।

আচ্ছা থাক।

এই বলে' সে বিদায় নিলো।

পরদিন সকাল বেলায় প্যারেডের সময়ে মজর আলি মেজর নীলকে গুলি ক'রে হত্যা করলো।

সবাই অবাক হ'য়ে গেল। এমন অকারণে হত্যা! অনেকেই ভাবলো মজর আলি সাময়িকভাবে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছে।

কয়েক দিন পরে বড়লাট বাহাদুরের এজেণ্ট স্যার লেপেলে গ্রিফিনের বিচারের ফলে মজর আলির ফাঁসি হ'য়ে গেল।

এতক্ষণ আমি নীরবে শুনছিলাম, এবারে বললাম, এখানেই তাহলে রক্তের জের টানা শেষ হ'ল।

মুন্সাজী বল্‌ল,—কে জানে শেষ হ'ল কি না।

কেন ?

জেনারেল নীলের আর যদি কোন পুত্র থাকে, তবে তারাও রক্ষা পাবে না।

কেন ?

তাদের হত্যা করবার জন্যেও হাজার হাজার ছাপা বিজ্ঞপ্তি বিলি হচ্ছে

তাদের অপরাধ কি ?

মেজর নীলের অপরাধ কি ছিল ?

একজনের রক্তপাতেই কি একজনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি ?

একটি বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাতে কি মাত্র একটি ফল ফলে ? সার্জেণ্ট সাহেব প্রথম বিন্দু রক্তপাতের আগে চিন্তা করে দেখা দরকার সে রক্তবিন্দু মাটিতে পড়লে তার যে কোথায় শেষ হবে, কি প্রকার ফসল যে ফলবে তা কে বলতে পারে ? রক্তের বদলে রক্ত এ কথা সবাই জানে, কিন্তু একবিন্দু রক্তপাতের পরিণামে কত ভয়াবহ রক্তবৃষ্টি হ'তে পারে তার হিসাব তো হয় নি। সার্জেণ্ট সাহেব, রক্তপাতের উৎসটাকে মাত্র আমরা জানি, সে প্রবাহ যে মহাসমুদ্রে গিয়ে অবসিত তার মানচিত্র কি অঙ্কিত হ'য়েছে ? তবে ? সফর আলির রক্তবিন্দু অজস্র শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত হ'য়ে গিয়ে কোন্ সর্বনাশের বনস্পতি-কে সৃষ্টি করবে তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। তবে ?

জেনারেল নীলের অন্য পুত্রদের হত্যা করবার বিজ্ঞপ্তি তোমার আছে কাছে কি ?

খুব সম্ভব আছে। কিন্তু অনেক রাত হ'য়েছে এখন আর নয়। কাল সকালে খুঁজে দেখবো এখন।

আর একটা কথা, মজর আলির সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানলে কি ক'রে ?

সে-কথাও কাল সকালে।

এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নিজ কক্ষে প্রস্থান করিল।

আমিও ঘরে গিয়া শুইলাম বটে, তবে ঘুম আসিল না, কেবলি সফর আলি, মজর আলি, জেনারেল নীল, মেজর নীল নামগুলি মনের মধ্যে মাকুর মতো চলাচল করিয়া একখানি স্বপ্নবসন বয়ন করিয়া তুলিতে লাগিল—আর তার উপর মাঝে মাঝে কৌতুকময়ী আমিনা তারার মতো, হীরকের মতো, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পরে ঘাসের ডগায় সঞ্চিত অশ্রুবিন্দুর মতো ফুল কাটিয়া কাটিয়া দিতে লাগিল।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিলে বেয়ারা চা লইয়া আসিল, প্রথমেই শুধাইলাম, মুন্সীজী কোথায়?

লোকটা বলিল—হুজুর, তিনি ঘণ্টা দুই আগে চলে গিয়েছেন।

কোথায়?

তা তো জানি না।

তিনি কোথাকার লোক?

তা কেউ জানে না।

তাঁর আসল নাম কি?

জানি না হুজুর।

ডাক-বাংলোর রেজিস্ট্রি বইয়ে নিশ্চয় আছে।

ইংরাজিতে লেখা আছে, পড়তে জানি না।

আচ্ছা বইখানা এখানে নিয়ে এসো।

রেজিস্ট্রি বই আনীত হইলে দেখিলাম। সেদিনকার পাতায় দুটি মাত্র নাম লিখিত আছে। একটি আমার, অপর নামটি ধুন্দুপন্থ, বন্ধনীর মধ্যে আছে নানা সাহেব, পেশা মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশবা, নিবাস পুণা, হাল মোকাম বিঠুর।

ঘরের মধ্যে বজ্র পড়িলেও বোধ হয় এমন চম্‌কাইয়া উঠিতাম না, হাত কাঁপিয়া খানিকটা চা পড়িয়া গেল। ভাগ্যে তখন বেয়ারাটা ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে ভাবিলাম Bosh! সবটাই ধাপ্পা। ভাবিলাম ওর নাম নানা সাহেবও যেমন সত্য, ওর গল্পও তেমনি সত্য। ভাবিলাম মজর আলির হত্যাকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া একটা উপন্যাস বুনিয়া আমাকে বোকা বানাইয়া গেল। Bosh!

যতই ধাপ্পা মনে করি না কেন, কিছুতেই ঘটনাটার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না। তারপরে অনেক বছর চলিয়া গিয়াছে; আজও ঘটনাটা ভুলিতে পারি নাই। তাই লিপিবদ্ধ করিলাম, একজনের অভিজ্ঞতা দশ জনের হইয়া উঠিলে এবারে বোধ হয় ভুলিতে পারিব।

সেই লোক তো বটে ?

নিঃসন্দেহ।

এমন নিঃসন্দেহ হওয়ার কারণ ?

প্রথমতঃ লোকটার স্বীকারোক্তি, দ্বিতীয়তঃ বয়সের হিসাব, তৃতীয়তঃ পুলিস গেজেটে যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে মিল।

তা মিলিয়ে দেখেছ নাকি ?

না দেখে একটা লোককে গ্রেপ্তার করি কি ভাবে ? বিশেষ যে সে লোক তো নয়।

কিন্তু তেমন লোক তোমার গুজরাটের রাজকোট শহরে আসতে যাবে কেন?

ও সন্দেহ তো যে কোন শহর সম্বন্ধেই উঠতে পারে।

তা অবশ্য পারে কিন্তু হঠাৎ তোমার সন্দেহ জাগতে গেলো কেন ?

লোকটা এ অঞ্চলে অপরিচিত, দুদিন ধরে শহরের মধ্যে বট গাছতলায় বসে ছিল—অনেকে বলে আট-দশ দিন। ব্যাপার কি তদন্ত করবার জন্য ইন্সপেক্টার দয়াভাইকে পাঠাই। দয়াভাই খুব চালাকচতুর, আগেকার আমলের পুলিস ইন্সপেক্টারের মত মূর্খ নয়, পড়াশোনা আছে। এ কালের ছোকরা, সে বেশ ভালো ক'রে তদন্ত করে এসে অনুকূল রিপোর্ট দিল।

তুমি কি বলতে চাও যে, লোকটা নিজের পরিচয় প্রকাশ ক'রলো ?

প্রথমটা করে নি, জেরায় পড়ে ক'রেছে।

আশ্চর্য।

আশ্চর্য কি, পুলিসের জেরায় অনেক সাহেবই কাৎ হন তো নানাসাহেব।

তারপরে ?

তারপরে আর কি, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এলাম থানায়। খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা ক'রলাম। কবুল ক'রলো সে নানাসাহেব। আমি শুধোলাম, তুমি যা বলছো তার পরিণাম কি হ'তে পারে জানো ?

সে বললো, পরিণাম যাই হোক, এই হচ্ছে নির্জলা সত্য।

কিন্তু হঠাৎ এতদিন পরে এ সত্য প্রকাশ করবার হেতু ?

উত্তর তো আপনি নিজেই দিলেন। এতদিন পরে এ কথা প্রকাশ হওয়ায় আর দোষ কি ?

দণ্ডযোগ্য অপরাধ কখনো তামাদি হয় না। কাজেই বুঝে সুঝে কথা ব'লো।

কথায় কাজ কি, কাগজ কলম বের করুন লিখিত স্বীকারোক্তি দিচ্ছি।

ভাবলাম উত্তম। লিখিত স্বীকারোক্তি থাকলে ভুল হ'লে আমাকে আর কেউ দায়ী করতে পারবে না।

এতকাল পরে নানাসাহেবের আবির্ভাব। আমরা তো পড়েছি তার মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যু যে হয় নি তা দেখতেই পাচ্ছ তো।

যদি সেই লোক হয়।

সন্দেহের অবকাশ আর কোথায় ? চল না একবার 'লক্ আপে' দেখে আসবে।

সে মন্দ নয়। কিন্তু না মরলে এতদিন ছিল কোথায় ?

সে বলে তিব্বতে ছিল।

হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ ?

বুড়ো হয়েছে, কবে মরে যাবে, তীর্থ ক'রতে এসেছে।

ফাঁসির হুকুম আছে জেনেও তীর্থ ক'রতে আসা। বিঠলজি যদি সত্যি হয় এর মূলে ঘোর রহস্য আছে, হয়তো কোন বিদেশী রা'ষ্ট্রর হয়ে ষড়যন্ত্র পাকাতে এসেছে। কেসটা কৌশলে হ্যাণ্ডল ক'রতে হ'বে।

সেই সব পরামর্শের জন্যেই তো তোমাকে ডাকা।

আমার তো মনে হয় এখনি পলিটিক্যাল এজেণ্টকে সব জানানো আবশ্যক।

আমারও সেই রকম ধারণা, অবশ্য ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তাঁরও কিছু করবার সাধ্য নেই।

তা হ'লে তুমি বলছো যে, একটা বড় মাছ এবারে জালে পড়েছে ?

মাছ ! রাঘব বোয়াল।

জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না, জাল সুদ্ধ তোমাকে না টেনে নিয়ে জলে নামে।

বল কি ?

বলি কি। নানাসাহেব সিপাহী বিদ্রোহের নেতা, পেশবার সিংহাসনের দাবিদার, হ'লে হ'তে পারতো হিন্দুস্থানের বাদশা।

কিন্তু চৈৎরাম, লোকটাকে দেখে তো মারাত্মক মনে হয় না।

দেখে কি তোমাকে নির্বোধ মনে হয় ?

আমি কি নির্বোধ ?

না তাই বলছি, চল একবার 'লক্ আপে' লোকটাকে দেখে আসি।

তখন বিঠলজি ও চৈৎরাম দুজনেই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট লক আপের উদ্দেশে রওনা হইল।

কিছুক্ষণ পরে আসামী পরিদর্শন শেষ করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া আসিল।

বিঠলজি শুধাইল— কি আর সন্দেহ আছে ?

চৈৎরাম বলিল, একটুও নয় কিন্তু আশ্চর্য লাগছে কি জান, জীবনে ছোট বড় কত আসামীই তো দেখলাম, এরকম বশংবদ আসামী আগে দেখি নি।

আগে কি দেশবিখ্যাত নানাসাহেবকে দেখেছো ?

নিজ মুখে সমস্ত কূটতর্কের অবসান ক'রে দেয়। আমি শুধোলাম, বয়স কত ?

আটষট্টি, ইতিহাসে পড় নি ১৮২৭ সালে নানাসাহেবের জন্ম— এখন ১৮৯৫ সাল, কত হ'ল ? আটষট্টি নয় ?

শুধোলাম, আর প্রমাণ আছে ?

তোমরা কি প্রমাণের খবর রাখ শুনি। মুখে বসন্তের দাগ, কপালে বর্শার ক্ষতচিহ্ন—বাল্যকালে খেলতে গিয়ে লেগেছিল, পিঠে অস্ত্রোপচারের দাগ, অস্ত্র ক'রেছিল কানপুরের ডাক্তার মেজর ব্রিউস। এসব খবর রাখো ? তবে কি ক'রে সনাক্ত করবে ? যাও যাও

তারপরে বলিল, আগে 'লক-আপের' বাইরে না গেলে আর দূরে যাওয়া কেমন ক'রে সম্ভব? তক্তপোশ থেকে নামলে তবে তো গাড়ী চড়া, কি বলো! চলো বাইরেই যাওয়া যাক।

সকলে বাহিরে আসিল। এবারে নানা বলিল—আমাকে নানা ব'লে বুঝেছো তো?

না।

তার মানে?

সরকারের হুকুম তোমাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

মুক্তি? নানাকে? সিপাহী বিদ্রোহের নেতাকে? বিবিঘরের হত্যাকারীকে?

নানা নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ করিতে লাগিল।

তোমরা যে আমাকে বিস্মিত করলে!

বস্তুতঃ পুলিশ সুপারদ্বয়ও কম বিস্মিত হয় নাই। তাহাদের নিজেদের ধারণা লোকটা সত্যই নানা, কিন্তু তাহারা হুকুমের চাকর। সরকারের হুকুম লোকটাকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দাও, তাহাকে লইয়া যেন কোন আদিখ্যেতা না করা হয়, তাই তাহারা হুকুম তামিল করিতে আসিয়াছে।

পলিটিক্যাল এজেন্ট কলিকাতায় বড়লাটকে তার করিয়া নানার উপস্থিতি জানায় ও তাহার সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করে। বড়লাট স্থির করেন যে, লোকটা সত্যসত্যই নানা হইলেও তাহাকে নানা বলিয়া স্বীকার না করাই বুদ্ধির কাজ। নানা বলিয়া একবার স্বীকার করিলেই দেশময় চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা দেখা দিবার আশঙ্কা। সরকার তাহার একনম্বর শত্রুকে হাতের মুঠায় পাইয়া কখনোই ছাড়িয়া দিতে পারে না—ইহাই লোকে বিশ্বাস করিবে, কাজেই লোকটা প্রকৃত আসামী হইলেও লোকচক্ষে তাহার গুরুত্ব বা মূল্য থাকিবে না। সরকারের এ চাল যেমন সূক্ষ্ম তেমনি সার্থক—এবং ইহার পরিণামে প্রত্যাশিত ফল ফলিল। সকলেরই বিশ্বাস হইল লোকটা ভণ্ড বা

পাগল, নানাসাহেব নয়। এমন কি ক্রমে ক্রমে পুলিশ সুপার দুজনেও নিজেদের পূর্বতন বিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নানা আশাভঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল—তোমরা পাগল।

'আরে তুমি পাগল' বলিয়া একজন পুলিশ ধাক্কা দিয়া বারান্দা হইতে তাহাকে পথে ফেলিয়া দিল।

ব্যর্থ বিক্রমে নানা লাফাইতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—তোমাদের এমন সাহস, তোমাদের এমন সাহস?

আরে নানাসাহেব তো দেবতা! সে কি তোমার মত বাউরা?

ভণ্ড কোথাকার! নানাসাহেব সেজে সেলাম নিতে এসেছে! যাও ভাগো!

ভাগবো? কেন ভাগবো? হিন্দুস্থান আমার রাজ্য নয়!

তাহার উক্তিতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে বাজারে রটিয়া গিয়াছিল যে, একটা পাগল আসিয়া নিজেকে নানাসাহেব বলিয়া দাবী করিতেছে। মজা দেখিবার জন্য থানার কাছে কতক লোক জুটিয়া গেল।

সরকারের সাধ্য কি আমাকে গ্রেপ্তার করে, আমি হিন্দুস্থানের বাদশা!

লোকে বিচিত্র মন্তব্য করিতে লাগিল, কেহ বলিল—রসক্ষেপা, কেহ বলিল—পাগল নয়, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কেহ বলিল, জোচ্চোর।

গ্রেপ্তারের কিছুমাত্র আশা নাই দেখিয়া নানা বাজারের দিকে রওনা হইল। আর বলিতে লাগিল—আমি ধুন্দুপন্থ পেশবা নানা-সাহেব, হিন্দুস্থানের বাদশা! তোমরা সবাই শোন কোম্পানী চুরি করে আমার গদি কেড়ে নিয়েছে।

সে বলিতে লাগিল—আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তবে কোম্পানীর লোক আমাকে গ্রেফতার করে না কেন?

বাজারের লোক কেহ শুনিল, কেহ শুনিল না।

যে শুনিল বলিল—আরে রামঃ, ঐ বুড়োটা নানাসাহেব! নানা-সাহেব যে দেবতা।

এই বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

অপর একজন বলিল, আমার বাবা নানাসাহেব কে দেখেছেন, তাঁর মুখে শুনেছি নানার গা থেকে জ্যোতি বেরুতো আর সেই সঙ্গে বেরুতো চন্দনের গন্ধ, চারিদিক আমোদিত হয়ে থাকতো।

আর একজন বলিল, নাও ভাই নিজের কাজে মন দাও, পাগলের কথা ছাড়—কিসে আর কিসে।

নানার পিছনে একদল ছেলে জুটিয়া গেল, তাহারা ছড়া বাঁধিয়া গান ধরিল—

নানাসাহেব খানা খায়
থানা থেকে বেরিয়ে যায়,
থানায় ছিল বরকন্দাজ
মাথায় তুলে দিল তাজ
মাথায় তাজ আর খালি পায়
নানাসাহেব খানা খায়!

নানা ছেলের দলকে তাড়া করে, তাহারা সরিয়া যায়। নানা আবার চলিতে থাকে। ছেলের দল আবার গান ধরে। গান ধরে আর নানার গায়ে ধুলা ছিটাইয়া দিয়া বলিতে থাকে—

হোলি হ্যায় হোলি হ্যায়
নানাসাহেব খানা খায়।

নানা এবারে শহরের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। কেহ তাহাকে গ্রেফতার করিল না, কেহ স্বীকার করিল না—এমন কি অধিকাংশ লোক একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। নিন্দাও একপ্রকার মদ, তাহাতেও মানুষকে চেতাইয়া রাখে, নানার ভাগ্যে দুঃখের দ্রাক্ষা চোলাই করা সে মদটুকুও জুটিল না।

তাহার পা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, তবু তাহাকে চলিতে হইবে। সে ভাবিতেছে যদি পড়িয়া মরিতে হয় তাহা ঐখানে, ঐ নির্জন-প্রান্তরে, এখানে নয়। অবিশ্বাসীদের এই শহরে নয়। অসহায়, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, বিস্মৃত নানাসাহেব মলিন বাষ্পগুচ্ছের মতো দিগন্তের দিকে ভাসিয়া চলিল। ধীরে ধীরে একা একা। তাহার ভাগ্যে অবশেষে সেই পিশাচীর ভবিষ্যদ্বাণীই বুঝি সফল হইল। দেশব্যাপী বিস্মৃতি ও উপেক্ষাতে নানার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

সমাপ্ত